[*Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal. Vide Notification No. Syl./71/54, dated 15.12.54.*]

পাঠ-মঞ্জুষা

[নূতন পাঠ্যসূচী-অনুসারে সপ্তম শ্রেণীর জন্য লিখিত]

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক,
আশুতোষ-কলেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক ও
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, এম্. এ.

প্রণীত

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২।

১৯৫৫

মুখবন্ধ

কালে-কালে, যুগে-যুগে ও দেশে-দেশে সাহিত্যই জাতীয় চরিত্রকে সমুন্নত ক'রে তুলেছে এবং সেই-সঙ্গে মানুষকেও সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনের পথে চালিত ক'রেছে। সৎ-সাহিত্য-পাঠ চিত্তোৎকর্ষ-সাধনের ও জ্ঞান-বিস্তারের যেমন সহায়তা করে, তেমনি মানুষকে বিপুল আনন্দও দেয়। এই আনন্দই সংসার-পথের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। যুগস্রষ্টা সাহিত্যিক কবিদের রচনা-পাঠের দ্বারা জ্ঞানসূর্য্য অন্তরের অন্ধকার দূর ক'রে মানুষকে সচ্চিদানন্দের সম্মুখীন ক'রে দেয়—ইহা শাশ্বত সত্য। বাল্য ও কৈশোর-কাল থেকে যদি যুগস্রষ্টা কবি ও সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, তা'হ'লে দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল বালকবালিকারা যে নিজেদের চরিত্র-গঠনে সমর্থ হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য। দেশের শিক্ষাবিস্তার-ক্ষেত্রে যাঁরা কর্ণধার, তাঁরা সঙ্কলন-পুস্তকের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যালয়-গুলিতে এই শ্রেণীর পুস্তক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ক'রেছেন। সে উদ্দেশ্য সার্থক ক'রতে হ'লে যাঁরা অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যশালিনী বাঙ্গালা-ভাষার স্রষ্টা, তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি থেকে সঙ্কলন ক'রে বালক-বালিকাদের চিত্তোন্নতি, ভাবোন্নতি ও চরিত্রবিকাশের পথ যাতে সুগম হয়, তার দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

বাঙ্গালাভাষার যাঁরা ধারক, বাহক ও স্রষ্টা, তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা-সমূহ থেকে যে রচনাগুলি এই **পাঠ-মঞ্জুষা**-নামক পুস্তকখানিতে চয়ন করা হ'য়েছে, আমি আশা করি আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের তাতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

প্রত্যেকটি রচনার সঙ্গে সংক্ষিপ্তসার ও অনুশীলনী সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এই সঙ্কলন-গ্রন্থটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ ক'রেছে। এই সঙ্কলন-গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রবার বিষয় এই যে, নূতন পাঠ্যসূচী-অনুসারে সপ্তম শ্রেণীর জন্য ইহাতে যে-সকল রচনা সঙ্কলন করা হ'য়েছে, সেগুলি নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য-প্রস্তুতির সহায়ক হবে।

জাতির ভবিষ্যৎ-নির্ম্মাতা শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ এই পুস্তক-খানির উপযোগিতা উপলব্ধি ক'রলে বিশেষ আনন্দিত হ'ব।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

পাঠ-মঞ্জুষা

প্রথম ভাগ

শকুন্তলা-মিলন

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

[কশ্যপের আশ্রমে শকুন্তলার গর্ভজাত সন্তান ভরতকে দেখিয়া দুষ্মন্তের মনে অপত্যস্নেহ জাগিয়া উঠিল। বালকটির পরিচয় পাওয়ার জন্য তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল; পরে শকুন্তলার সহিত দেখা হওয়ায় এই বালক যে তাঁহারই পুত্র, তাহা বুঝিতে পারিলেন; শকুন্তলার সহিত তাঁহার পুনর্মিলন হইল।]

রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেবরাজ-সারথে! এই পর্ব্বতের কোন্ অংশে ভগবান্ কশ্যপের আশ্রম?" মাতলি কহিলেন—"মহারাজ! মহর্ষির আশ্রম অতি দূরবর্ত্তী নহে; চলুন, আমি সঙ্গে যাইতেছি।" কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক ঋষিকুমারকে সমাগত দেখিয়া মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবান্ কশ্যপ এক্ষণে কি করিতেছেন?" ঋষিকুমার কহিলেন—"তিনি এক্ষণে নিজ-পত্নী অদিতিকে ও অন্যান্য ঋষিপত্নীদিগকে পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম শ্রবণ করাইতেছেন।" তখন রাজা কহিলেন—"তবে আমি এখন তাঁহার নিকট যাইব না।" মাতলি কহিলেন—"মহারাজ! আপনি এই অশোকবৃক্ষমূলে অবস্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি মহর্ষির নিকট আপনার আগমন-সংবাদ নিবেদন করি।" এই বলিয়া মাতলি প্রস্থান করিলেন।

এমন সময়ে—"বৎস! এত দুর্ব্বৃত্ত হইতেছ কেন" এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া মনে-মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন—"এ অবিনয়ের স্থান নহে, এই অরণ্যে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যাবতীয় জীবজন্তু স্থান-মাহাত্ম্যে হিংসা, দ্বেষ, মদ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সৌহার্দ্দ্যে কালযাপন করে, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার বা অনুচিত ব্যবহার করে না; এমন স্থানে কে দুর্ব্বৃত্ততা করিতেছে? যাহা হউক, এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইল।"

কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া রাজা দেখিলেন—এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু সিংহ-শিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে এবং দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। অনন্তর তিনি কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া সস্নেহে কহিতে লাগিলেন—"আপন পুত্রকে দর্শন করিলে মন যেমন স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? অথবা আমি পুত্রহীন বলিয়া এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুকে দেখিয়া আমার মনে এইরূপ প্রগাঢ় স্নেহরসের আবির্ভাব হইতেছে।"

এদিকে সেই শিশু সিংহ-শাবকের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে তাপসীরা কহিতে লাগিলেন—"বৎস! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি, তুমি কেন অকারণে উহাকে ক্লেশ দাও? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহ-শিশুকে ছাড়িয়া দাও, ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর যদি তুমি উহাকে ছাড়িয়া না দাও, তবে সিংহী তোমাকে জব্দ করিবে।" তাপসীরা ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া প্রলোভনার্থে কহিলেন—"বৎস! যদি তুমি সিংহ-শিশুকে ছাড়িয়া দাও, তবে তোমায় একটি ভাল খেল্‌না দিব।"

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে-ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল।

তখন তিনি মনে-মনে কহিতে লাগিলেন—"কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত আমার মন এত উৎসুক হইতেছে ? পরের পুত্র দেখিলে মনে যে এত স্নেহোদয় হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।"

বালক অত্যন্ত দুরন্ত হইয়াও রাজার নিকট অত্যন্ত শান্তস্বভাব হইল। ইহা দেখিয়া এবং উভয়ের আকার-গত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া তাপসীদ্বয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা সেই বালককে ক্ষত্রিয়সন্তান নিশ্চয় করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—"এই বালক যদি ঋষিকুমার না হয়, তবে কোন্ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি।"

একজন তাপসী কহিলেন—"মহাশয়! এ পুরুবংশীয়।" রাজা শুনিয়া মনে-মনে কহিতে লাগিলেন—"আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, ইহারও সেই বংশে জন্ম।"

পরে রাজা তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন—"এ দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে; অতএব এ বালক কি সম্পর্কে এখানে আসিল ?" তাপসী কহিলেন—"ইহার জননী অপ্সরাসম্বন্ধে এখানে আসিয়া এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া মনে-মনে কহিতে লাগিলেন—"পুরুবংশ ও অপ্সরাসম্বন্ধ—এই দুই কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে পুনর্ব্বার আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহা হউক ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেহ-ভঞ্জন হইবে।"

এই মনে করিয়া তাপসীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন—"আপনি জানেন, এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ রাজার পুত্র ?" তখন তাপসী কহিলেন—"মহাশয়! কে সেই ধর্ম্মপত্নী-পরিত্যাগী পাপাত্মার নাম

কীর্ত্তন করিবে ?” রাজা শুনিয়া মনে-মনে কহিতে লাগিলেন—“এই কথা আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই এককালে সকল সন্দেহ দূর হইবে।”

রাজা মনে-মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় অপরা তাপসী কুটীর হইতে একটি মৃন্ময় ময়ূর আনয়ন করিলেন এবং কহিলেন—“বৎস! কেমন শকুন্ত-লাবণ্য দেখ।” এই বাক্যে শকুন্তলা শব্দ শ্রবণ করিয়া বালক কহিল—“কই, আমার মা কোথায় ?” তখন তাপসী কহিলেন—“না বৎস! তোমার মা এখানে আসেন নাই। আমি তোমাকে পক্ষীর লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি।” এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন—“মহাশয়! এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনার আর কাহাকেও দেখে নাই, নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে; এই নিমিত্ত অত্যন্ত মাতৃবৎসল। শকুন্ত-লাবণ্য শব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার জননীর নাম শকুন্তলা।”

সমুদয় শ্রবণ করিয়া রাজা মনে-মনে কহিতে লাগিলেন—“ইহার জননীর নাম শকুন্তলা। কি আশ্চর্য্য! উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার বিষয়ে খাটিতেছে। এই সকল কথা শুনিয়া আমার আশাই বা না জন্মিবে কেন ?” শকুন্তলা অনেকক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখেন নাই, এই নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া অন্বেষণ করিতে-করিতে সহসা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা বিরহকৃশা মলিন-বেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগলে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও অকস্মাৎ রাজাকে

দেখিয়া স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া স্থিরনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন ; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। বালক শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র—"মা, মা" করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল—"মা! ও কে? ওকে দেখে তুই কাঁদিস্ কেন?" তখন শকুন্তলা গদ্গদবচনে কহিলেন—"বাছা! ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।"

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা মনের আবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন—"আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা বলিবার নয়। তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই তোমাকে অবমাননা করিয়া বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই আমার সকল বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল; তদবধি আমি কি দুঃখে কালহরণ করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। পুনর্ব্বার তোমার দর্শন পাইব, আমার সে আশা ছিল না। এক্ষণে তুমি প্রত্যাখ্যান-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

অনুশীলনী

১। কশ্যপের আশ্রমে সিংহ-শিশুর সহিত ক্রীড়ারত বালককে দেখিয়া দুষ্মন্তের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং তাপসীদের সহিত রাজার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। কশ্যপের আশ্রমে শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের পুনর্মিলনের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

অথবা

শকুন্তলা-মিলন শীর্ষক গল্পটি সংক্ষেপে লিখ।

৩। ব্যাখ্যা কর—(ক) এ অবিনয়ের স্থান…অনুসন্ধান করিতে হইল।

(খ) মহাশয়! কে সেই…দূর হইবে।

বৃষ্টি

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

[বৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র জলবিন্দু মাত্র, এইরূপ একটি জলবিন্দুর কোন কাজ করিবার শক্তিই নাই ; কিন্তু লক্ষ-লক্ষ বৃষ্টি-বিন্দু মিলিতভাবে পতিত হইয়া জগতের বুকে প্রলয়ের সৃষ্টি করে ; নদী-নালা, খাল-বিল পূর্ণ হইয়া উঠে ; দেশ উর্ব্বর হইয়া উঠে এবং ফুল-ফল ও ধন-ধান্যে ধরণী পূর্ণ হইয়া উঠে। একতা-বলে অসাধ্য সাধন হয়।]

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি। আমরা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বৃষ্টি-বিন্দু, একা একজনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না ; কিন্তু আমরা সহস্র-সহস্র লক্ষ-লক্ষ কোটী-কোটী কণা মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সে-ই ক্ষুদ্র, সে-ই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সে-ই তুচ্ছ। দেখ ভাইসকল, কেহ একা নামিও না—অর্দ্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে-সহস্রে, লক্ষে-লক্ষে, অর্ব্বুদে-অর্ব্বুদে এই শুষ্ক পৃথিবী ভাসাইব। পর্ব্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া পৃথিবীতে নামিব ; নির্ঝরপথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া তরঙ্গের উপর মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এস সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু? ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া আমরা দেশ-দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র, তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড়-বড় গ্রাম ও অট্টালিকা স্রোতোমুখে ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। বায়ু! বায়ু ত আমাদের গোলাম।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যেই বল—নহিলে আমরা কেহই নই। চল—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি-বিন্দু—কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ-লতা-বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি-বিন্দু, আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

তবে আয়, ডেকে-ডেকে, হেঁকে-হেঁকে, নব-নীল কাদম্বিনী! বৃষ্টি-কুল-প্রসূতি! আয় মা দিঙ্মণ্ডলব্যাপিনি! সৌরতেজঃ-সংহারিণি! এস, গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি! এস ভগিনি সুচারুহাসিনি চপলে! বৃষ্টি-কুল-মুখ আলো কর! আমরা ডেকে-ডেকে, হেসে-হেসে, নেচে-নেচে ভূতলে নামি। তুমি বৃত্র-মর্ম্মভেদী বজ্র, তুমিও ডাক না—এ-উৎসবে তোমার মতো বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পড়িবে! পড়, কিন্তু কেবল গর্ব্বোন্নতের মস্তকের উপর পড়িও। ক্ষুদ্র পরোপকারী শস্যমধ্যে পড়িও না—আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ ত এই পর্ব্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গ। ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও না—আমরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে, নদী দুলিতেছে,—ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষা চষিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে,—কেবল বেনে-বউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা! দুই-একখানা রেখে যা না—আমরা খাব।

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গরস জানি। মল্লিকার মধু ধুইয়া লইয়া গিয়া ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি-মুড়কির দোকান দেখিলে

প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাকরাণী কাপড় শুকাইতে দিলে প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি। আমরা কি কম পাত্র!

তা যাক্—আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্ব্বত-কন্দর, দেশ-প্রদেশ ধুইয়া লইয়া নূতন দেশ নির্ম্মাণ করিব। বিশীর্ণা সূত্রকায়া তটিনীকে কূলপ্লাবিনী দেশমজ্জিনী অনন্তদেহধারিণী অনন্ততরঙ্গিণী জলরাক্ষসী করিব। কোনও দেশের মানুষ রাখিব—কোনও দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব—অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে?

অনুশীলনী

১। বৃষ্টির আত্মকাহিনীর ভিতর দিয়া লেখক কি বলিতে চাহিয়াছেন?

অথবা

বৃষ্টির আত্মকাহিনী পাঠ করিয়া তুমি কি শিক্ষা লাভ করিয়াছ? 'বৃষ্টি'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া তোমার শিক্ষার সারবত্তা প্রমাণ কর।

২। বৃষ্টির কার্য্য বর্ণনা কর।

অথবা

"আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি-বিন্দু—আমাদের সমান কে! আমরাই সংসার রাখি"—'বৃষ্টি'-শীর্ষক প্রবন্ধটি হইতে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া এই উক্তিটি বুঝাইয়া দাও।

৩। ব্যাখ্যা কর—(ক) দেখ, যে একা, সে-ই ক্ষুদ্র……সে-ই তুচ্ছ।
(খ) তুমি বৃত্র-মর্ম্মভেদী বজ্র…আমাদের বড় ব্যথা।
(গ) দেখ, পর্ব্বত-কন্দর…বলবান্ কে?

পালামৌ

(সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

[পালামৌ যাইবার পথে লেখক হাজারিবাগ, রাণীগঞ্জ, বরাকর ও ছোট-নাগপুর হইয়া যান। এই সমস্ত স্থানের বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, পথের বিবরণ লেখকের সুনিপুণ লেখনীস্পর্শে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে পালামৌ পাহাড় দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল—যেন কতকগুলি মেঘ পৃথিবীর বুকে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে; আরও কাছে গিয়া মনে হইল—শুধু অসংখ্য পর্ব্বত ও দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছাড়া সেখানে আর কিছু নাই; কিন্তু পরে পালামৌ-এ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সেখানে পাহাড়, জঙ্গল, নদী ও গ্রাম সবই আছে। একটি একশিলা পাহাড় দেখিয়া লেখক খুব বিস্মিত হইয়াছিলেন। তথাকার অধিবাসীরা কোল—দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; আলোকোজ্জ্বল নগরীতে তাহারা সুন্দর না হইলেও পালামৌ-র অরণ্য-পরিবেশের মধ্যে তাহাদিগকে খুব সুন্দর দেখায়।]

(১)

বহুকাল হইল, একবার আমি পালামৌ-প্রদেশে গিয়াছিলাম। প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই-একজন বন্ধুবান্ধব আমাকে অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তাৎপর্য্য বয়স। গল্প করা এ-বয়সের রোগ; কেহ শুনুন বা না শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি, এমন নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন-পর্ব্বত, কুসুমিত-কানন প্রভৃতি যে চ'ক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্ব্বত কেবল

প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে, সে-স্থান কোন্ দিকে, কতদূর ; অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে, এই বিবেচনায় ডাক-গাড়ি ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব্বপাড়ে গাড়ি থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, আমার গাড়ি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়োয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

এমন সময় কতকগুলি বালক-বালিকা আসিয়া আমার গাড়ি ঘেরিয়া "সাহেব একটি পয়সা", "সাহেব একটি পয়সা"—এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি-চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালী বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম—"আমি সাহেব নহি।" একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল—"হাঁ, তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল—"তবে তুমি কি ?" আমি বলিলাম—"আমি বাঙ্গালী।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল—"না, তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ি চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

এই সময় একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল, তাহা

সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময়ে আমার গাড়ি অপর পাড়ে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়; অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়টি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

অপরাহ্নে দেখিলাম, একটি সুন্দর পর্ব্বতের নিকট দিয়া গাড়ি যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম—"একবার এই পর্ব্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল—"পাহাড় এখান হইতে অনেক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।" আমি এ কথা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথায় যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না; অতএব গাড়োয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে পনের মিনিট কাল দ্রুত পদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্ব্বত পূর্ব্বের মত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে

আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার-সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্ত্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর অবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ি লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম।

যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ি প্রবেশ করিলে তাহা কোন ধনবান্ ইংরাজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম দূর হইল। বারান্দায় গুটিকতক বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট গিয়া গাড়ি থামিলে আমি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাগ্রহে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন আমি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিলাম, তিনিই বাটীর কর্ত্তা। তিনি শতলোক-সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেইরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয় সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

রাত্রি দেড়প্রহরের সময় বাহক-স্কন্ধে আমি ছোটনাগপুর যাত্রা করিলাম, তথা হইতে পালামৌ দুই-চারিদিনের মধ্যে পৌঁছিলাম। পথের পরিচয় আর দিব না, এই কয়েক ছত্র লিখিয়া অনেককে জ্বালাতন করিয়াছি, আর বিরক্ত করিব না। এবার ইচ্ছা রহিল

মূল বিবরণ ভিন্ন অন্য কথা বলিব না; তবে যদি দুই-একটি অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে বয়সের দোষ বুঝিতে হইবে।

(২)

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে-যাইতে যখন বাহকগণের নির্দ্দেশ-মত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল, যেন মর্ত্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব, মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি-পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল, কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তারপর আরও দুই-এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান, সমুদয় যেন মেঘদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজি দ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষে আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে, সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম নদী, গ্রাম সকলই আছে; দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত

তরঙ্গ। আমার বোধ হয়, অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয়, যেন দেখিয়াছিলাম, তরঙ্গগুলি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল। কোনটি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়া পশ্চিমদিকে নামে নাই। এইরূপ অর্দ্ধপাহাড় লাতেহার-গ্রাম-পার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই, সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়; এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কাল পাথর ইত্যাদি; কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয় একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝর্‌ঝর্ করিতেছে। তাহার একস্থান অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই। এখন বোধ হয়, অশ্বত্থগাছটি আপন অবস্থানুরূপ কার্য্য করিতেছে; সকল বৃক্ষই যে বাঙ্গালার রসপূর্ণ কোমল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনাকষ্টে কালযাপন করিবে, এমত সম্ভব নহে। যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন। এখন আমি অশ্বত্থটির প্রশংসা করি।

এক্ষণে সে-সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই-একটি বলি। অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে-দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সঙ্কীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল,

অনেক স্থলে উভয়-পার্শ্বস্থ লতা-পল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল। বর্ণনায় যেরূপ "শাল-তাল-তমাল-হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেইরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল-হিন্তাল একেবারে নাই, কেবল শালবন, অন্য-অন্য গাছও আছে; শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশী কদম্ববৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি-দুর্গম; কোথাও তাহার ছেদ নাই, এইজন্য ভয়ানক। মধ্যে-মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। এইরূপ বন দিয়া যাইতে-যাইতে একস্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিস্ময়কর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্ব্বে মেদিনীপুর-অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়; এই জন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দ আরও যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটি মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পাল্কীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর দূরে নহে। অল্প বিলম্বেই অর্দ্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে সেখানে দুই-একটি মধু বা মহুয়াবৃক্ষ ভিন্ন প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্ব্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্ব্বতচ্ছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোল-বালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনও দেখি নাই; সকলেরই গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুক্‌ধুকীর পরিবর্ত্তে এক-একখানি গোল আরসী; পরিধানে ধড়া, কর্ণে বনফুল; কেহ

মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে, কেহ বা বসিয়া আছে, কেহ-কেহ নৃত্য করিতেছে। (সকলগুলিই যেন ব্রজবালক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল) যেরূপ স্থান, তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল ; চারিদিকে কাল পাথর, পশুও পাথুরে, তাহাদের রাখালও সেইরূপ।

অনুশীলনী

১। পালামৌ-প্রদেশের সৌন্দর্য্য বর্ণনা কর। কোল-বালকেরা দেখিতে কিরূপ ?

২। 'পালামৌ'-শীর্ষক ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে লিখ।

৩। ব্যাখ্যা কর—(ক) এখন পর্ব্বত কেবল…বলিয়া মনে হয়।
(খ) বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ…আনন্দ হয়।
(গ) কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র…ঘন নিবিড় বন।
(ঘ) আমার বোধ হয়…তরঙ্গ তুলিয়াছিল।
(ঙ) যাহার ভাগ্যে কঠিন…তাহার অবলম্বন।
(চ) যেরূপ স্থান…তাহাদের রাখালও সেইরূপ।

সন্তোষ

(অক্ষয়কুমার দত্ত)

[লালসাই মানুষের দুঃখের কারণ। মনের মধ্যে একটা সন্তোষের ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারিলে লালসার নিবৃত্তি আসে, দুঃখের মাত্রাও কমিয়া আসে ; কিন্তু অবিরত অসহনীয় দুঃখের ভিতর দিয়া সময় কাটাইয়াও উন্নতির চেষ্টা না করা সন্তোষের লক্ষণ নহে। মানুষের মত সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিবার জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, নিজের শক্তি ও সামর্থ্য-অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত উপায়ে যতদূর উন্নতি সম্ভব, তাহাতে তুষ্ট থাকাই সন্তোষের লক্ষণ।]

কেহ-কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ যে, কিছুতেই তৃপ্ত নহে। তাহাদের যত অর্থলাভ ও যত পদবৃদ্ধি হইতে থাকে, লালসারূপ অগ্নি-শিখা ততই প্রজ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে অশেষ প্রকার উৎপাতে পাতিত করে। তাহারা প্রচুর ধনশালী হইয়াও সতত উদ্বিগ্ন এবং উৎকণ্ঠিত-চিত্তে দিন যাপন করে। সন্তোষ এইরূপ অনর্থক উদ্বেগের মহৌষধ, ইহা তাহারা অবগত নহে। সন্তোষ যেমন সুখজনক, অসন্তোষ তেমনই দুঃখজনক। মনুষ্যেরা সকল অবস্থাতেই সন্তোষরূপ স্পর্শমণি দ্বারা সুখ-স্বরূপ স্বর্গলাভে সমর্থ হইতে পারে ; কিন্তু অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও যে দুঃখ-শান্তির চেষ্টা না করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে চিরকাল কষ্ট স্বীকার করিবে, এমত নয়। যে অবস্থায় থাকিলে অন্নবস্ত্রের ক্লেশবশতঃ শরীর শীর্ণ হয়, অপরিষ্কৃত, অপরিশুষ্ক, সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করাতে শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম হয় এবং পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে সঙ্গতির অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করাইতে ও পুত্রকন্যাদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে অসমর্থ হইতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এই সমস্ত কষ্ট-নিবারণার্থ যত্ন

না করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নহে। যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে নানামতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নয়। সন্তোষের যথার্থ লক্ষণ এরূপ নহে। আপনাপন উপায় ও ক্ষমতানুসারে ন্যায়ানুগত চেষ্টা দ্বারা যতদূর উৎকৃষ্ট অবস্থা হইতে পারে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া এবং যে-সকল অনিষ্ট ঘটনা নিবারণ করিবার শক্তি নাই, তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক স্থিরভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই যথার্থ সন্তোষের লক্ষণ। এরূপ সন্তোষ সুখের আলয়।

অনুশীলনী

১। সন্তোষের লক্ষণ কি ? সন্তোষ কি ভাবে সংসারে সুখ আনয়ন করিতে পারে বুঝাইয়া বল।

২। ব্যাখ্যা কর—(ক) মনুষ্যেরা সকল···সমর্থ হইতে পারে।

(খ) আপনাপন উপায়···সন্তোষের লক্ষণ।

দীক্ষা

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

[সন্তানদের উদ্দেশ্য স্বদেশের স্বাধীনতা-উদ্ধার। কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। সুতরাং সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন। এখানে সত্যানন্দের মুখে সন্তান-ধর্ম্মের নিয়মগুলিই বর্ণিত হইয়াছে।]

সত্যানন্দ কথাবার্ত্তা-সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব্ব শোভাময় প্রকাণ্ডাকার চতুর্ভুজমূর্ত্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন

অপূর্ব্ব শোভা। রজত, স্বর্ণ ও রত্নে রঞ্জিত বহুবিধ প্রদীপে মন্দির আলোকিত হইয়াছে। রাশি-রাশি পুষ্প স্তূপাকারে শোভা করিয়া মন্দির আমোদিত করিতেছিল। মন্দিরে আর একজন উপবেশন করিয়া মৃদু-মৃদু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি দীক্ষিত হইবে?"

সে বলিল—"আমাকে দয়া করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন—"তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত এবং অনশনে আছ ত?"

উভয়ে। আছি।

সত্যা। তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর, সন্তানধর্ম্মের নিয়মসকল পালন করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্যা। যতদিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্যা। মাতা-পিতা ত্যাগ করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্যা। ভ্রাতা-ভগিনী?

উভয়ে। ত্যাগ করিব।

সত্যা। দারাসুত?

উভয়ে। ত্যাগ করিব।

সত্যা। আত্মীয়-স্বজন? দাস-দাসী?

উভয়ে। সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্যা। ধন—সম্পদ্—ভোগ ?

উভয়ে। সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

সত্যা। ইন্দ্রিয় জয় করিবে ? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না ?

উভয়ে। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।

সত্যা। ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবে না ? যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব-ধনাগারে দিবে ?

উভয়ে। দিব।

সত্যা। সনাতন-ধর্ম্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে ?

উভয়ে। করিব।

সত্যা। রণে কখনও ভঙ্গ দিবে না ?

উভয়ে। না।

সত্যা। যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয় ?

উভয়ে। জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্যা। আর এক কথা—জাতি। তোমরা কি জাতি ? মহেন্দ্র—কায়স্থ জাতি। অপরটি কি জাতি ?

অপর ব্যক্তি বলিল,—"আমি ব্রাহ্মণকুমার।"

সত্যা। উত্তম। তোমরা জাতি ত্যাগ করিতে পারিবে ? সকল সন্তান একজাতীয়। এই মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-বিচার নাই। তোমরা কি বল ?

উভয়ে। আমরা সে বিচার করিব না, আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে-সকল প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ ও শিশুপাল প্রভৃতির বিনাশহেতু, যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বনিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।

উভয়ে। তথাস্তু।

সত্য। তোমরা গাও, "বন্দে মাতরম্।"

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দিরমধ্যে মাতৃস্তোত্র গান করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

অনুশীলনী

১। সন্তানধর্ম্মের নিয়মাবলী বর্ণনা কর।

২। 'দীক্ষা'-নিবন্ধটির সারাংশ নিজের ভাষায় রচনা কর।

৩। ব্যাখ্যা কর—(ক) সেখানে তখন···আমোদিত করিতেছিল।
(খ) যিনি রাবণ···নরকে প্রেরণ করিবেন।

পরিচ্ছন্নতা

(ভূদেব মুখোপাধ্যায়)

[পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা এক না হইলেও প্রায় একই। কারণ অন্তর পবিত্র হইলে বাহ্য-পরিচ্ছন্নতাও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

অভ্যস্ত হইলে একদিকে যেমন ঘরের লক্ষ্মী-শ্রী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অপরদিকে তেমনি দ্রব্যের অপচয় বন্ধ হইয়া ধনবৃদ্ধি হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলে বহু সংক্রামক-রোগের হাত হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়।]

পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা এক পদার্থ নয়—কিন্তু প্রায়ই এক। যে পুরুষ বা স্ত্রী বাহ্যদর্শনে পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন, সে যে অন্তরেও বিশুদ্ধ এবং সুব্যবস্থিত হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যাহার মন বিশুদ্ধ এবং পরিপাটি, তাহাকে পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন অবশ্যই হইতে হয়। সমস্ত বাহ্য ব্যাপারকে হেয় জ্ঞান করা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিবারই ফল।

পৃথিবী কিছু নয়—শরীর কিছু নয়—সংসার কিছু নয়—এ সকলের প্রতি যত্ন এবং আদর করা ক্ষুদ্রাশয়তার লক্ষণ, শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে বটে, কিন্তু দেহ এবং গৃহস্থিত সমুদয় সামগ্রী সুবিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত রাখিবার অবশ্যকর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে যথোচিত পরিমাণে উল্লিখিত আছে। গৃহের এবং গৃহস্থিত দ্রব্যের যথোচিত বিলেপন ও সম্মার্জ্জনাদি— স্নান, ভোজন, আচমন ও বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার আমাদের অবশ্যকরণীয় প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট। বিশেষতঃ গৃহস্থের বাটীতে উপাসনাগৃহ বা ঠাকুরঘর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সকল গৃহস্থেরই শুচিতার এবং পরিচ্ছন্নতার এক-একটি আদর্শ পাইবার উপায় করা হইয়াছে। ঠাকুরঘর যে ভাবে রাখ, আবাসের সকল ঘর সেইভাবে রাখিলেই হইল। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের ঘর কি ঠাকুরঘর নয়?

শুচিতাপ্রিয় ইহুদীদিগের মধ্যে সংক্রামক রোগ অল্প হয়। তাহার কারণ এই যে, গৃহ এবং গৃহোপকরণসমস্ত অতি সুপরিষ্কৃত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত উহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে আদেশ আছে এবং ইহুদীরা আপনাদের শাস্ত্রের সমস্ত আদেশ ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিপালন করে। পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে সকলেই চায়—উহা ধর্ম্ম, স্বাস্থ্যকর এবং সাক্ষাৎ সুখপ্রদ; কিন্তু একথাও বলি, পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন থাকা

কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ; লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া সম্যক্ ঘটিয়া উঠে না ; কিন্তু পরিচ্ছন্নতা-রক্ষার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টায় লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানও ঘটিয়া উঠিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, এইজন্যই পরিচ্ছন্নতা-সাধনের মূলমন্ত্রগুলি লক্ষ্মী-সাধনের মূলমন্ত্র হইতে অভিন্ন। ঐ মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

দ্রব্যের অপচয় সম্পত্তি-সঞ্চয়ের বিরোধী ব্যাপার। গৃহোপকরণ প্রভৃতি সম্যগ্‌রূপে রক্ষা করিতে হইলেই তাহাদিগকে ছড়াইয়া রাখিবার যো নাই ; তাহাদিগকে যথাস্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হয় এবং তাহা রাখিলেই গৃহের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদিত হয়।

সকল দ্রব্য হইতেই কোন-না-কোন প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে। ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া নেকড়া, কুটনার খোসা, ঘরের আবর্জ্জনা—এইরূপ সকল পদার্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। ছেঁড়া কাগজ এবং ছেঁড়া নেকড়া ঘরের যেখানে-সেখানে ফেলিয়া রাখিও না, একটি নির্দ্দিষ্ট পাত্রে রাখ, দিনকয়েকের মধ্যেই এত জমিয়া যাইবে যে, বদল দিয়া নূতন কাগজ পাইতে পারিবে। আনাজের খোসা ও ডাইলের ভূষি ঘরে ছড়াইয়া রাখিলে ঘর নোঙ্‌রা দেখাইবে ; তুলিয়া একটা কোন পাত্রে জমা কর ; পোষিত গরু-বাছুর-ছাগলাদির খাদ্য হইবে। ঘর ঝাঁট দিয়া যে ধূলা এবং আবর্জ্জনা পাওয়া যায়, তাহাও জড় করিয়া ক্ষেত্রে ফেলিয়া দিলে উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। অতএব পরিচ্ছন্নতাসাধনের একটি প্রধান সূত্র এই যে, ঐ প্রকার দ্রব্যসকল রাখিবার পৃথক্-পৃথক্ স্থান এবং পাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবে এবং দ্রব্যসকল যাহার যে স্থান, তথায় রাখিতে অভ্যাস করিবে—নিজে অভ্যাস করিবে এবং পরিজনকেও অভ্যাস

করাইবে। ঐরূপ করা এবং করান অভ্যস্ত হইলেই অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে এবং ঘর-দ্বার ঝর্‌ঝরে দেখাইবে।

দ্রব্যসমূহ অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখা সম্পত্তি-রক্ষা এবং সম্পত্তি-বৃদ্ধির প্রতিকূল। সুতরাং গৃহের দ্রব্যসমূহ যে অবস্থায় থাকিলে অব্যবহার্য্য হয়, এমন অবস্থায় রাখিতে নাই। কোন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, কি অন্যরূপে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেই তাহাকে অবিলম্বে সারাইয়া কিংবা বদলাইয়া লওয়া উচিত। এই নিয়ম-প্রতিপালনে অভ্যস্ত হইলে অতিরিক্ত খরচ বাঁচিয়া যায় এবং ঘরও পরিচ্ছন্ন থাকে।

গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্যাদি শীঘ্র বিনষ্ট হইতে দিলে সত্বরই ধনক্ষয় হয়। রৌদ্র, জল, বায়ু এবং কীটাদি দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন-ভিন্নরূপে নিরন্তরই ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব দ্রব্যসকলকে এমন অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করিবে, যাহাতে ঐ প্রকার ক্ষয় যতদূর সম্ভব নিবারিত হইতে পারে। স্যাঁতসেঁতে না হইলে, ময়লা না ধরিলে ও মরিচা না পড়িলে দ্রব্যসকল অধিকদিন টিঁকে। অতএব গৃহোপকরণসমস্ত যাহাতে যথাপরিমাণে পরিষ্কৃত এবং ঝর্‌ঝরে থাকে, তাহার যত্ন করা অভ্যাস করিতে হয়। তাহা করিলেই পরিচ্ছন্নতা-সাধন করা হয়।

গৃহবাসী প্রাণিমাত্রকে যে পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক, তাহা অর্থশাস্ত্র এবং শরীরশাস্ত্র উভয় শাস্ত্রেরই অভিমত। এ-বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব যে, গৃহপালিত জীবগণের, আপনাদিগের সন্তানসন্ততিগণের এবং দাসদাসী-পরিজন-গণের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করিলেই সমুদয় কাজ হইল না। গৃহিণীকেও সুবেশা হইয়া থাকিতে হয়। যে গৃহিণী সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে

ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জ থাকিতে চাহেন না, তাঁহার অন্তরে একটি গূঢ় অভিমান আছে, সেটি ভাল নয়। যিনি চেষ্টা করিয়া পারেন না, তাঁহার লক্ষ্মী-চরিত্র-জ্ঞান এখনও সুপক্ব হয় নাই ; যিনি বাঁদি এবং বিবি উভয়ই হইতে পারেন, তিনি লক্ষ্মী—তিনি সম্পত্তি এবং শোভা উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

অনুশীলনী

১। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা কি ? সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার কি সম্বন্ধ আছে ?

২। দ্রব্যের অপচয় বন্ধ করিয়া কিভাবে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে, বুঝাইয়া দাও।

অথবা

'দ্রব্যের অপচয় সম্পত্তি-সঞ্চয়ের বিরোধী ব্যাপার।'—উপযুক্ত উদাহরণ দিয়া এই উক্তিটি বুঝাইয়া দাও।

অথবা

'পরিচ্ছন্নতা-রক্ষার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টায় লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানও ঘটিয়া উঠিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।'—উপযুক্ত উদাহরণ দিয়া এই উক্তিটি বুঝাইয়া দাও।

৩। ব্যাখ্যা কর—(ক) পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা এক।
(খ) কিন্তু পরিচ্ছন্নতা…মন্ত্র হইতে অভিন্ন।
(গ) দ্রব্যের অপচয়…বিরোধী ব্যাপার।
(ঘ) যিনি বাঁদী এবং…অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মাইকেল মধুসূদন

(ভূদেব মুখোপাধ্যায়)

[হিন্দুকলেজেই মধুসূদনের সঙ্গে ভূদেববাবুর পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ভূদেববাবুর জাতীয় ঐতিহ্যে গভীর শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়াই মধুসূদন ভূদেববাবুকে খুব শ্রদ্ধার চ'ক্ষে দেখিতেন। পরীক্ষায় তেমন ভাল ফল না দেখাইতে পারিলেও মধুসূদনের প্রতিভা যে অসাধারণ ছিল, তাহা ভূদেববাবু বুঝিতেন। খৃষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করার পরেও তাঁহাদের বন্ধুত্ব অটুট রহিয়া গেল। বিলাত হইতে ফিরিবার পর মধুসূদন 'হেক্টর-বধ'-কাব্য রচনা করেন এবং তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু ভূদেববাবুর নামে সেই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন।]

মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দুকলেজে। সংস্কৃত-কলেজ ছাড়িয়া আমি যখন হিন্দুকলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর যৌবনের প্রাক্কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্তপ্রায় হইয়াছে।

রামচন্দ্র মিত্র-নামক জনৈক শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। আমি যে-দিন প্রথম ভর্ত্তি হইলাম, সেইদিন রামচন্দ্রবাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়ালা মাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরাজী-শিক্ষকেরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে ভাল-বাসিতেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্র-বাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই তিনি পড়াইতে-পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল; কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির

পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়-চোপড় ছাড়িতে দেরী সহিল না, একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা, পৃথিবীর আকার কি রকম?" তিনি বলিলেন—"কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই কথা বলিয়াই তিনি আমাকে একখানি পুঁথি দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—"ঐ গোলাধ্যায়-পুঁথিখানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি।" আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে—"করতলকলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলম্।" বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম।

পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্রবাবুকে বলিলাম—"আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা তো পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন; এই দেখুন, তিনি বরং এই শ্লোকটি আমাকে পুঁথিমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্রবাবু সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া বলিলেন—"কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল; তা, তোমার বাবা বলিবেন বৈ কি; তবে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ।"

রামচন্দ্রবাবুতে ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয়, তখন ক্লাসের একটি ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপে আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কাল হইলেও ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড়-বড় এবং অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিলে অতি বুদ্ধিমান্ ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম, ততক্ষণই মধ্যে-মধ্যে অতি তীব্রদৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছুটির পর একেবারে আমার নিকটে আসিয়া 'শেক্হাণ্ড' করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই, তোমার নাম

কি, কোথায় বাড়ী তোমার” ইত্যাদি। আমি তাহার এইরূপ অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণ এবং সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া একে-একে তৎকৃত সকল প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

ইনিই মধু। এই দিন হইতেই ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল এবং অত্যল্পকালমধ্যেই বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। মধু মধ্যে-মধ্যে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমপাঠীদিগের মধ্যেও কেহ-কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। আমার মা সকলকেই অতিশয় যত্ন করিতেন; আমাদের সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন; গায়ে-মাথায় ধূলা লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন। সেই হইতেই আমার মায়ের উপর মধুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।

মধু আমাদের বাড়ীতে আসিত, কিন্তু আমি কোনদিন মধুর বাড়ীতে যাই নাই; মধু আমায় তজ্জন্য কোনদিন অনুরোধও করে নাই। বোধ হয়, আমাদের বাড়ীর ধরণ ও মধুর বাবার বাসাবাড়ীর ধরণ স্বতন্ত্র ছিল; সুতরাং তথায় লইয়া যাইলে পাছে আমার প্রীতি না হয়, এইজন্যই সম্ভবতঃ মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোনদিন করে নাই। ক্লাসে মধু ও আমি একসঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত, সেখানি আমায়-না পড়াইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। ফলকথা উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই প্রগাঢ় হইয়াছিল।

আমরা উভয়ে যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার আমার স্কুলের ষোল মাসের বেতন বাকী পড়ে। মাসিক পাঁচ টাকা-হিসাবে বেতন, ষোল মাসে আশি টাকা হয়। আমার পিতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং এত টাকা পরিশোধের পর আবার মাসিক

পাঁচ টাকা বেতন দিয়া আমাকে হিন্দুকলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য ছিল না ; অগত্যা আমার হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল—"তুমি নাকি হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ করিবে ?" আমি বলিলাম—"হাঁ, আমাদের অবস্থা ত' বুঝিতেছ; পাঁচ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া বাবার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইবে।"

এই কথায় মধু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল—"কেন ভাই, টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হইবে ? আমি ত আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমার টাকা হইতে তোমার স্কুলের বেতন দেওয়া চলিতে পারিবে।"

ঐ বৎসর পঞ্চম শ্রেণীতে আমরা জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ায় আমাকে মধুর অর্থসাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই, কিন্তু একথা বলিয়া রাখি যে, মধুর টাকা গ্রহণ করিতে আমি যে কুণ্ঠিত হইতাম, তাহা নহে ; আমি মধুকে এতই আপনার বলিয়া মনে করিতাম।

পঞ্চম শ্রেণীতে জুনিয়র-বৃত্তি পাইয়া আমি, মধু ও আমাদের আর কয়েকজন সহপাঠী—আমরা একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। মধুর সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য পূর্ব্বের ন্যায় তখনও অক্ষুণ্ণ। ইংরাজী-কবিতা মধু যাহা লিখিত বা নূতন পড়িত, আমাকে জেদ করিয়া শুনাইত, কিন্তু আচার-ব্যবহারের বিষয়ে আমার সহিত তাহার কোন কথাবার্ত্তা হইত না। সে-সকল বিষয় আমার নিকটে সে সযত্নেই গোপন রাখিত ; কখনও কথা উঠিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিত।

একদিন কলেজে আসিয়া মধু আপনার মাথা আমাকে দেখাইয়া বলিল—"দেখ দেখি, কেমন চুল কাটিয়াছি। ইহার জন্য আমার এক মোহর ব্যয় হইয়াছে।" মধু সেদিন ফিরিঙ্গীর মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল—সম্মুখের চুলগুলো বড়, ঘাড়ের চুলগুলো ছোট। আমি বলিলাম—"এ কি করিয়াছ? তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই। তুমি একজন জিনিয়াস্ (genius), যারা জিনিয়াস্, তারা নূতন-নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। তুমি যদি পাঁচ চূড়া, কি সাত চূড়া, কি ন'চূড়া কেটে আস্তে, তাহ'লে যা হোক একটা নূতন রকম কিছু হ'তো। তা' না ক'রে ফিরিঙ্গীর মত চুল কেটে এসেছ। এরূপ নীচ অনুকরণ-প্রবৃত্তিটা ভাল নয়!"

আমার কথায় মধু যেন কিছু বিরক্ত হইল বলিয়া বোধ হইল। সে-দিন আর আমার কাছে সে ঘেঁসিয়া বসিল না, একটু তফাতে বসিল। আমার মনে কিছু কষ্ট হইল। কথাটা বলা ভাল হয় নাই, মধু অন্তরে ব্যথা পাইয়াছে। যাহা হউক, আমি মধুর কাছে সরিয়া বসিলাম এবং তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম

তাহার পরদিন মধু আর কলেজে আসিল না। অনুসন্ধানে জানিলাম, মধু খৃষ্টান হইতে গিয়াছে; শুনিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। মধু যেদিন খৃষ্টান হইল, সেদিন আমরা তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তাহার পর মধু স্মিথসাহেবের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন থাকিয়া বিশপ্স্ কলেজে গমন করে; তখনও আমি মধুকে মধ্যে-মধ্যে দেখিতে গিয়াছি। মধুও আমার সহিত বন্ধুভাবে সম্ভাষণাদি করিয়াছে।

বিশপ্স্ কলেজে কিছুকাল থাকিয়া মধু মাদ্রাজ যাত্রা করে। সেখানে যাইয়া সে আমাকে একখানি পত্র লেখে। পত্রখানির মধ্যে

আমার মার কথার উল্লেখ করিয়া মধু লিখিয়াছিল—“আমার প্রণীত 'ক্যাপটিভ্ লেডী'-নামক পুস্তকে যে রাণীর কথা আছে, সেই রাণী তোমার মাকে আদর্শ করিয়া গঠন করা হইয়াছে।”

কিছুদিন পরে মধু আবার দেশে ফিরিয়া আইসে। ঐ সময়ে নর্ম্যাল-স্কুলের প্রধান-শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায় ঐ পদে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার জন্য একটি প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয়; মধু ও আমি উভয়েই ঐ পরীক্ষা দিই এবং উক্ত পদটি আমিই পাই। কিন্তু, এখানে একটি কথা বলি, পরীক্ষায় ভাল হইলেই যে প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে। মধু ও আমি যতবার এক-সঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছি, প্রায় সকল বারই আমি উহার উপরে হইয়াছি, কিন্তু, তাহা হইলেও তাহার প্রতিভা আমাদিগের মধ্যে অতুল্য ছিল বলিয়াই আমি জানিতাম।

নর্ম্যাল-স্কুলের উক্ত পরীক্ষা দিবার সময়ও মধুর বাঙ্গালাভাষায় তাদৃশ দখল হয় নাই। তখনও সে 'পৃথিবী' লিখিতে 'প্রথিবী' লিখিত; কিন্তু সেই মধু কিছুকাল পরেই, আমার নর্ম্যাল-স্কুলে থাকার সময়েই 'মেঘনাদ-বধ' প্রণয়ন করে এবং মধুর প্রণীত সেই 'মেঘনাদ-বধ'-কাব্য অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমি নর্ম্যাল-স্কুলে আমার ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছি।

মধু আপনার বিদ্যাবুদ্ধি খুবই বেশী মনে করিত। এমন কি সে মধ্যে-মধ্যে আমাদের বলিত—“তোমরা আমার জীবন-চরিত লিখিও, আমি পৃথিবীর সকল কবির অপেক্ষা বড় কবি হইব।” আমি মধুর কথায় হাস্য করিতাম, কিন্তু সে যে একজন অতি প্রতিভাসম্পন্ন যুবা, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্রমে-ক্রমে আমাকে অনেক—অন্যূন কুড়ি লক্ষ

ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখনও দেখিতে পাই নাই।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধু একবার আমার সহিত চুঁচুড়ার বাড়ীতে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন তাহার পূর্ব্বের মত চেহারা ছিল না, চক্ষু আর সেরূপ সমুজ্জ্বল ছিল না, পূর্ব্বের সেই অতি সুমিষ্ট স্বর এক্ষণে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল, ঠোঁট পুরু এবং শরীরও স্থূল হইয়াছিল। মধুর পোষাক সাহেবী, কিন্তু আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তার পর মধু কাপড় চাহিল, বলিল—"আমাকে কাপড় দাও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব।" ঐ সময়ে মধুর মনে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না।

ইহার কিছুদিন পরে মধু 'হেক্‌টর বধ'-কাব্য রচনা করে এবং আমাকে কোন কথা না জানাইয়া পুস্তকখানি আমারই নামে উৎসর্গ করে। অনেকদিন পরস্পর সংস্রব-রহিত থাকিলেও আমার প্রতি মধুর বরাবরই যে একটু আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল, উল্লিখিত উৎসর্গ-ব্যাপার তাহারই প্রমাণস্বরূপ বই আর কি?

অনুশীলনী

১। মধুসূদনের সঙ্গে ভূদেববাবুর পরিচয় এবং তাঁহাদের বন্ধুত্বের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। মধুসূদনের সম্বন্ধে ভূদেববাবুর মতামত তোমার নিজের কথায় বুঝাইয়া দাও।

৩। ব্যাখ্যা কর—"তোমরা আমার···বড় কবি হইব।"

দুর্গ-বিজয়

(রমেশচন্দ্র)

[রঘুনাথজী হাবিলদারের সাহস ও বীরত্বে শিবাজ যেভাবে রুদ্রমণ্ডল-দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, এই নিবন্ধে তাহারই বর্ণনা পাওয়া যায়।]

জয়সিংহের চেষ্টায় দিল্লীশ্বরের সহিত শিবাজীর শীঘ্রই সন্ধি-স্থাপন হইল। শিবাজী মোগলদিগের নিকট হইতে যে-যে দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত ফিরাইয়া দিলেন। আহম্মদনগর রাজ্যের মধ্যে যে দ্বাত্রিংশৎ দুর্গ অধিকার বা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও বিংশটি ফিরাইয়া দিলেন। অবশিষ্ট দ্বাদশটি মাত্র আওরঙ্গজীবের অধীনে জায়গীরস্বরূপ রাখিলেন।

শিবাজীর সহিত যুদ্ধসমাপ্তির পর রাজা জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া সেই প্রদেশ দিল্লীশ্বরের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। শিবাজী এক্ষণে জয়সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিজয়পুরের সুলতান আলি আদিল সাহের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন এবং আপন মাউলী-সৈন্য দ্বারা বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন।

অল্পদিনমধ্যে বিজয়পুরের অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবাজী অবশেষে একটি অতিশয় দুর্গম পার্ব্বত্যদুর্গ অধিকার করিবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, পূর্ব্বে কাহাকেও তাহার সংবাদ দিতেন না। এমন কি, নিজের সৈন্যেরাও তাহা পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিত না। সায়ংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। এক প্রহর রজনীর সময় গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে, তিনি রুদ্রমণ্ডল-

দুর্গ আক্রমণ করিবেন। নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসমেত তিনি দুর্গাভিমুখে গমন করিলেন এবং অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমতলভূমি। তাহার মধ্যে একটি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর রুদ্রমণ্ডল-দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতে উঠিবার একটি মাত্র পথ আছে। অন্যদিক্‌গুলি কেবল জঙ্গল ও শিলারাশিতে পরিপূর্ণ। শিবাজী সেই কঠোর দুর্গম স্থান দিয়া সেনা-গণকে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন পার্ব্বত্য-বিড়ালের ন্যায় বৃক্ষ ধরিয়া শৈল হইতে শৈলান্তরে লম্ফ দিতে-দিতে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্য এরূপ পর্ব্বতারোহণে সমর্থ কিনা সন্দেহ। অর্দ্ধেক পথ উঠিলে পর শিবাজী সহসা দেখিলেন যে, উপরে দুর্গ-প্রাচীরের উপর কতকগুলি মশালের আলোক জ্বলিল।

শিবাজী চিন্তাকুল হইয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন। শত্রুরা কি তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পাইয়াছে? নচেৎ প্রাচীরের উপর এরূপ আলোক জ্বলিল কেন? শিবাজী নিজসৈন্যগণকে আরও সতর্কভাবে বৃক্ষ ও শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে-ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। বৃষ্টির জল-অবতরণে একস্থানে ধৌত ও ক্ষত হইয়া প্রণালীর ন্যায় হইয়াছিল। দুই পার্শ্ব উচ্চ, মধ্যস্থ গভীর। সেই প্রণালী বুকে হাঁটিয়া যাইলে সম্ভবতঃ শত্রুরা দেখিতে পাইবে না। এই পরামর্শ স্থির হইল। সমস্ত সৈন্য ধীরে-ধীরে সেই প্রণালীর মধ্য দিয়া পর্ব্বতারোহণ করিয়া অচিরাৎ উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল। শিবাজী মনে-মনে ভবানীকে ধন্যবাদ দিলেন।

সহসা তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন সেনা পতিত হইল। শিবাজী দেখিলেন, তাহার বক্ষঃস্থলে তীর লাগিয়াছে। আর একটি তীর, আর একটি, আরও বহুসংখ্যক তীর। শিবাজীর সমস্ত সৈন্য বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীরনিক্ষেপ থামিয়া গেল। শিবাজী বুঝিলেন যে, শত্রুরা তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াছে।

শিবাজী নিস্তব্ধে সেই বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুকে ভুলাইবার জন্য একশত সৈন্যকে দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া গোল করিতে আদেশ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল। সেই দিক্ হইতে শিবাজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ প্রহরী ও সৈন্যসকল সেইদিকে ধাবমান হইল।

রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীর হইতে শিবাজী বিংশ হস্ত দূরে আছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন যে, প্রাচীরের উপরে একজন প্রহরী। বৃক্ষের ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এইদিকে আসিয়াছে। একজন মাউলী নিঃশব্দে একটি তীর নিক্ষেপ করিল; হতভাগ্য প্রহরীর মৃতশরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত হইল।

সেই শব্দ শুনিয়া আর একজন, দুইজন, দশজন—ক্রমে দুই-তিনশতজন সৈনিক প্রাচীরের উপরে ও নীচে জড় হইল। শিবাজী রোষে ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিলেন, আর লুক্কায়িত থাকিবার উপায় দেখিলেন না। সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও বৃক্ষমধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রাচীর-তলের উপরিস্থিত মুসলমানেরা বর্শাচালনা করিয়া আক্রমণকারী-দিগকে নিহত করিতে লাগিল; তাহারাও অব্যর্থ তীরসঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল।
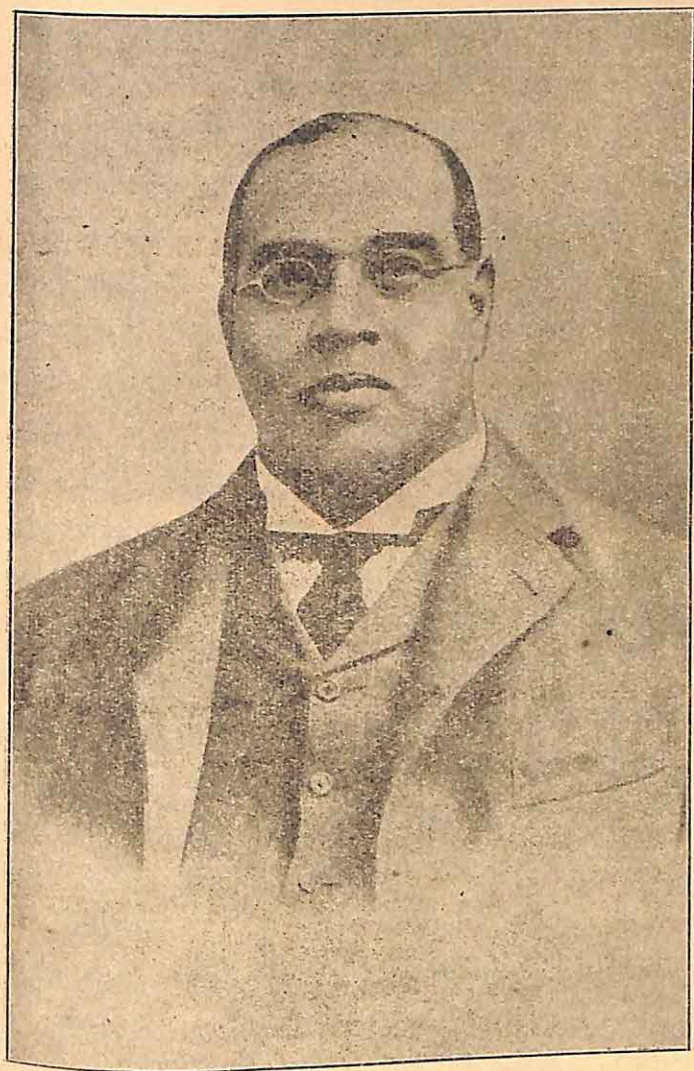
রমেশচন্দ্র দত্ত

সহসা এই সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর হইতে "শিবাজীকি জয়" এইরূপ বজ্রনাদ উত্থিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল যে, শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া রক্তাপ্লুত বর্শার উপর ভর দিয়া একজন রাজপুত-যোদ্ধা একলম্ফে রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীরের উপরে উঠিয়াছেন। তথায় তিনি পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন; পতাকাধারী প্রহরীকেও খড়্গচালনা করিয়া নিহত করিয়াছেন। প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া যে অপূর্ব্ব যোদ্ধা বজ্রনাদে "শিবাজীকি জয়" শব্দ করিয়াছিল, সেই যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবিলদার।

তখন মাউলীগণ রঘুনাথের বিক্রম দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সেই প্রাচীরের দিকে ধাবমান হইল। তাহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া প্রাচীরে উঠিল এবং রঘুনাথের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। শিবাজী তখন বজ্রনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন—"দ্বার খুলিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ দাহ করিব।" নির্ভীক পাঠান উত্তর করিলেন—"অগ্নিতে দগ্ধ হইব, কিন্তু, কাফেরের সম্মুখে দ্বার খুলিব না।"

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়গণ মশাল আনিয়া দ্বারে, জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল। উপর হইতে কিল্লাদার ও তাঁহার সঙ্গিগণ তীর নিক্ষেপ দ্বারা প্রাসাদে অগ্নিদান নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, অনেক মহারাষ্ট্রীয় বীর মশালহস্তে ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু অগ্নি জ্বলিল।

প্রথমে দ্বার-গবাক্ষ, পরে কড়িকাষ্ঠ, পরে সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল। সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণনাদে আকাশের দিকে উত্থিত হইল ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল। বহুদূরে পর্ব্বত ও উপত্যকা হইতে সেই আলোক

দৃষ্ট হইল ও সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল। সকলে জানিল যে, শিবাজীর দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে।

বীরের যাহা সাধ্য, পাঠান-কিল্লাদার রহমৎ খাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে বীরের ন্যায় মরিতে বাকী ছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে ; চারিদিকে খড়্গ উত্তোলিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের আশা নাই। এইরূপ সময়ে উচ্চৈঃস্বরে শিবাজীর আদেশ শ্রুত হইল—"কিল্লাদারকে বন্দী কর ; বীরের প্রাণসংহার করিও না।" রণশ্রান্ত আহত আফগানের হস্ত হইতে শিবাজীর সেনাগণ খড়্গ কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

অনুশীলনী

১। শিবাজীর রুদ্রমণ্ডল-দুর্গ-বিজয়ের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। এই কাহিনী হইতে শিবাজীর রণকৌশল-সম্বন্ধে কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

৩। "কিল্লাদারকে বন্দী কর ; বীরের প্রাণসংহার করিও না।"—এটি কাহার উক্তি ? এই উক্তি হইতে বক্তার কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

বুনো রামনাথ

(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

[জ্ঞানের সাধনায় যাঁহারা আত্মনিবেদন করেন, সাংসারিক সুখ, দুঃখ, অভাব ও অনটন প্রভৃতির প্রতি তাঁহাদের কোনও লক্ষ্য থাকে না। ভারতীয় সাধনার ইহাই বৈশিষ্ট্য। বুনো রামনাথ জ্ঞানমার্গের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। জড়জগতের বিচিত্র প্রলোভন তাঁহার সাধনার পথে বিঘ্ন হইবে ভাবিয়া তিনি লোকালয় ত্যাগ করিয়া গ্রাম-প্রান্তরে এক বনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; এই কারণে তাঁহার নাম হইল—বুনো রামনাথ। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অতুলনীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া নবদ্বীপের মান রক্ষা করিবার জন্য তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অর্থের প্রলোভন তাঁহাকে এখানে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।]

সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা অতিশয় পরিশ্রমী ও অতিশয় সরল-প্রকৃতির ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, ভাল করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিখিলে এবং শিখাইলে ধর্ম্ম হয়। সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত উদ্যম, সমস্ত অধ্যবসায় সংস্কৃত-গ্রন্থের পঠন-পাঠনে নিয়োজিত হইত। এইরূপ পঠন-পাঠনে নিরন্তর ব্যস্ত থাকায় অনেক সময় তাঁহারা সংসারের কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। অতি অল্পেই তাঁহাদের দিনপাত হইত। বড়মানুষী বা বাবুগিরির ধার দিয়াও তাঁহারা যাইতেন না। পঠদ্দশাতে অনেকেরই তেল জুটিত না, অথচ রাত্রিতে পড়িতেই হইবে। সুতরাং তাঁহারা 'শুক্‌না' পাতা জড় করিয়া রাখিতেন। রাত্রিতে পড়া মুখস্থ করিতে বসিয়া যদি কোথাও ঠেকিত, কয়েকটি পাতা আগুনে ফেলিয়া দিতেন, পাতা জ্বলিয়া উঠিলে সেই আলোকে পুঁথিখানি দেখিয়া লইতেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যমহাশয় প্রত্যেক

ছাত্রকে প্রত্যহ চাল ও কাঠ দিতেন, অপর সকল জিনিষ ছাত্রকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত। ছাত্রেরা পাঠে এমন মগ্ন থাকিত যে, তাহারা তরিতরকারীর কথা ভুলিয়া যাইত। যথাসময়ে ভাত চাপাইয়া দিয়া যখন দেখিত যে, কিছুই নাই, তখন নিকটবর্ত্তী কোন আমড়াগাছে উঠিয়া দুই-চারিটি আমড়া পাড়িয়া আনিয়া ভাতে দিত এবং তাহা দিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। ন্যায়শাস্ত্রের টোলে 'আমড়া-ভাতে ভাত খাওয়া' একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পড়ুয়ারা নিজের সকল কাজই নিজের হাতে করিত—কাপড় কাচিত, বিছানা করিত, ঘর ঝাঁট দিত।

ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরা নিজেরাও সামান্যভাবে দিনযাপন করিতেন। অনেকের বাড়ীতে পিতল-কাঁসার নামও ছিল না। একখানি চৌকি, একখানি মাদুর, একটা বালিশ ও শীতকালের জন্য একখানি গায়ের কাপড় থাকিলেই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিতেন; কিন্তু তাঁহারা ছাত্রদিগকে খাওয়াইতেন, যে-সকল ছাত্র বাড়ীতে না খাইবে, তাহাদের চাল ও কাঠ যোগাইতেন এবং অতিথি-সৎকার করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। যিনি যত বেশী ছাত্র পাইতেন, তাঁহার তত বেশী প্রসার-প্রতিপত্তি-লাভ ও সৎকার হইত; কিন্তু যাহা-কিছু লাভ হউক, তাহার ব্যয় হইত ধর্ম্মকার্য্যে, ভোগবিলাসে নহে। ছাত্রেরাও গুরুর দেখিয়া শিখিত—সংযম, মিতব্যয় এবং অল্পে সন্তোষ। যিনি যত বেশী লেখাপড়া শিখিতেন, সংসারের দিকে ঔদাসীন্য তাঁহার তত বেশী হইত। আমরা একটি উদাহরণ দিব।

প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে রামনাথ নামে একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ন্যায়শাস্ত্র পড়াইতেন। তিনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। সেইজন্য তিনি গ্রামের মধ্যে বাস করিতেন না। গ্রামের প্রান্তে

তাঁহার এক কুটীর ছিল। সেই কুটীরে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। কুটীরের সম্মুখে একটি তেঁতুলগাছ ছিল। তেঁতুল-তলায় তাঁহাদের রান্নাঘর, তাঁহাদের ভাঁড়ার ও উঠান ছিল। কিছুদূরে বনের ভিতরে বসিয়া রামনাথ ছাত্র পড়াইতেন। ছাত্রদিগকে চাল ও কাঠ যোগাইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। মোগল-বাদশাহেরা নবদ্বীপের ছাত্রদিগকে খোরাকী বলিয়া কিছু টাকা দিতেন। আমাদের দয়ালু গভর্ণমেণ্ট সে টাকা এখনও দিতেছেন এবং অনেক বাড়াইয়াও দিয়াছেন। রামনাথের ছাত্রেরা সে টাকার যে ভাগ পাইত, তাহাতেই আপনাদের যোগক্ষেম নির্ব্বাহ করিত। বনের ভিতর বসিয়া পড়াইতেন বলিয়া রামনাথের নাম হইয়াছিল 'বুনো রামনাথ'। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন।

নৈয়ায়িকেরা প্রধানতঃ যে গ্রন্থখানির পঠন-পাঠন করিতেন সেখানির নাম 'তত্ত্বচিন্তামণি'। তাঁহারা উহাকে বলিতেন, 'মূল' বা আসল-গ্রন্থ। ঐ মূলের চারিটি খণ্ড—প্রত্যক্ষ-খণ্ড, অনুমান-খণ্ড, উপমান-খণ্ড ও শব্দ-খণ্ড। অধিকাংশ পণ্ডিতই অনুমান-খণ্ড ও শব্দ-খণ্ডের কিয়দংশ পড়িতেন ও পড়াইতেন; কিন্তু রামনাথের 'চিন্তামণি'র চারিখণ্ডেই অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল; যে খণ্ডের যত টীকা-টিপ্পনী ছিল, সবই তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। কাহারও কোথাও ঠেকিলে তিনি রামনাথের কাছে যাইতেন, রামনাথ এককথায় তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশ চিরদিনই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষপাতী ও অভিভাবক ছিলেন। ছাত্রেরা পাঠ সমাপন করিয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইতেন; রাজা তাঁহার প্রকাণ্ড জমিদারীর কোন-না-কোন স্থানে তাঁহাদের বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। একখানি

বা দুইখানি গ্রামের উপর ব্যবস্থা দিবার ভার হইলে এবং ত্রিশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর পাইলে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। গ্রামের সকল লোকই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে মানিত, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় এবং পাল-পার্ব্বণে সিধা-ভোজ্য দিত, বিবাহাদিতে বৃত্তি এবং বিদায় দিত, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মনের সুখে সেই গ্রামে টোল করিয়া পড়ুয়াদের পড়াইতেন।

রামনাথ কিন্তু কোনদিন কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে যান নাই। তিনি বলিতেন—"বৃত্তি-ব্রহ্মোত্তর পাইলে লোভ জন্মিবে, লোভ জন্মিলে শাস্ত্র-চর্চ্চার ব্যাঘাত হইবে।" মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বজরা নবদ্বীপের ঘাটে বাঁধা ছিল, রাণী স্নান করিবার জন্য গঙ্গায় নামিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক পরিচারিকা ছিল। রামনাথের স্ত্রীও সেই সময়ে সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহার পরিধানে জীর্ণ বসন, হাতে মাত্র একগাছি লাল-সূতা—ঐ সূতাই পরিচয় দিতেছে যে, তাঁহার স্বামী আজিও বর্ত্তমান। স্নান করিয়া যখন ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী কলসীতে জল ভরিতেছিলেন, তখন সেই জল রাণীর গাত্রে লাগিল। রাণীর পরিচারিকা বলিল—"মর্ মাগী, হাতে একগাছা শাঁখাও জুটে না, লাল-সূতা বাঁধিয়াছে, কিন্তু, মাগীর তেজ দেখ, রাণীর গায়ে জল দিল।" ব্রাহ্মণী কলসী কক্ষে তুলিতে তুলিতে উত্তর দিলেন—"আমার হাতে এই লাল-সূতা এখনও আছে, তাই নবদ্বীপের মান এখনও আছে।" পরিচারিকারা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল; রাণীও শুনিয়া অবাক্।

কথাটা ক্রমে মহারাজার কানে গেল। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, স্ত্রীলোকটি রামনাথের ব্রাহ্মণী। মহারাজের অত্যন্ত

কৌতূহল হইল। তিনি রামনাথকে দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখেন যে, রামনাথ বনের মধ্যে গাছতলায় বসিয়া অনেকগুলি ছাত্র পড়াইতেছেন। আসনের মধ্যে এক-একখানি তালপাতার চাটাই। একজন ছাত্র মহারাজকে বসিতে একখানি চাটাই দিল। শিষ্টাচারের পর মহারাজ নিবিষ্টচিত্তে ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের অধ্যাপনা শুনিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ শুনার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কোন অনুপপত্তি আছে কি?" রামনাথ অমনি বলিয়া উঠিলেন—"চারি চিন্তামণির মধ্যে কোনখানেও আমার অনুপপত্তি নাই। একস্থানে এক অনুপপত্তি ছিল, ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, মাসখানেক হইল, তাহারও আমি উপপত্তি করিয়া দিয়াছি।"

অনুপপত্তি শব্দের দুই অর্থ হইতে পারে—এক অর্থ—অভাব, জিনিষপত্রের অভাব, আর এক অর্থ—বুঝিতে বা বুঝাইতে না পারা। মহারাজ প্রথম অর্থে জিজ্ঞাসা করিলেন, রামনাথ তাহা বুঝিতেই পারিলেন না, তিনি দ্বিতীয় অর্থে জবাব দিলেন। আবার মহারাজ বলিলেন—"আমি শাস্ত্রীয় অনুপপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, সাংসারিক অনুপপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।" উত্তর হইল—"ওঃ! সাংসারিক অনুপপত্তি! সে ত আমি কিছুই জানি না, ব্রাহ্মণী জানেন, বোধ হয়, কোন অনুপপত্তি নাই।"

মহারাজ কি করেন? অগত্যা কুটিরের দ্বারে আসিয়া রামনাথের ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, তোমার সংসারে কোন অভাব থাকে ত বল।" তিনি বলিলেন—"কোনও অভাব নাই। ঘরে শুইবার মাদুর আছে, ভাত খাইবার পাথর আছে, রাঁধিবার হাঁড়ি আছে, তেঁতুলগাছে যথেষ্ট পাতা আছে। কর্ত্তা তেঁতুলপাতার ঝোল খাইতে বড় ভালবাসেন।" মহারাজ ত শুনিয়াই অবাক্!

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি অত্যন্ত বিচারমল্ল ছিলেন। কোন একজন বড় পণ্ডিত পাইলেই তিনি তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাঁহাকে পরাস্ত করিতেন। তাঁহার মুখের সামনে কেহই দাঁড়াইতে পারিত না। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের পণ্ডিতেরা তাঁহার সহিত বিচারে অপদস্থ হইতেছেন দেখিয়া মহারাজ নবকৃষ্ণ প্রভৃতি প্রধান অধিবাসিগণ বুনো রামনাথকে আনাইতে লোক পাঠাইলেন।

নির্লোভ রামনাথ কিছুতেই আসিতে স্বীকার করিলেন না। পরে একজন প্রধান পণ্ডিত তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন—"আপনি না যাইলে বাঙ্গালার মান যায়, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দেশে-দেশে বলিয়া বেড়াইবে, বাঙ্গালা পণ্ডিতশূন্য। এ-কথায় নবদ্বীপের অপমান, আপনারও অপমান।" তখন রামনাথ অগত্যা যাইতে স্বীকার করিলেন। তাঁহার সমস্ত শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার সঙ্গে চলিল। কলিকাতার ধনিলোকগণ তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং তাঁহাকে খুব বড় এক বাড়ীতে বাসা দিলেন। বিচার আরম্ভ হইল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রামনাথের সহিত বিচারে পরাস্ত ও নির্ব্বাক্ হইলেন। চারিদিকে "ধন্য ধন্য" পড়িয়া গেল। কলিকাতার অনেক ধনিলোক তাঁহাকে অনেক বিদায়, বার্ষিক ও বৃত্তি দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু, রামনাথ দিগ্বিজয়ীর পরাজয়ের পর আর একমুহূর্ত্তও কলিকাতায় থাকিতে রাজী হইলেন না। বলিলেন—"এখানকার আবহাওয়ায়ই লোভ। এখানে থাকিলেই লোভ হইবে, লোভে শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যাঘাত হইবে। অতএব এখনই আমাকে নিজস্থানে পৌঁছাইয়া দাও।" এই বলিয়া তিনি বিদায় বা বার্ষিক কিছুনা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

অনুশীলনী

১। বুনো রামনাথ কে ছিলেন ? তাঁহার 'বুনো' নাম হওয়ার কারণ কি ? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। রামনাথের নির্লোভ প্রকৃতির দুইটি উদাহরণ দাও।

৩। প্রাচীনকালের শিক্ষা-পদ্ধতি এবং ছাত্র ও শিক্ষকের জীবনযাপন-প্রণালী-সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। ব্যাখ্যা কর—(ক) ন্যায়শাস্ত্রের টোলে …হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।
(খ) আমার হাতে এই…এখনও আছে।
(গ) এখানকার আবহাওয়ায়ই…ব্যাঘাত হইবে।

সেকালের জন্তু-জানোয়ার

(জগদানন্দ রায়)

[বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর ন্যায় পৃথিবীরও জন্ম-মৃত্যু আছে, পণ্ডিতদের মতে দেড়শত কোটি হইতে চারিশত কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর জন্ম হইয়াছিল। প্রথম অবস্থায় পৃথিবী এক প্রকাণ্ড জলন্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল। পরে ধীরে-ধীরে ঠাণ্ডা হইয়া জমাট বাঁধায় পাহাড়-পর্ব্বতের উৎপত্তি হয়। তাহার বহু পরে গাছপালা এবং গাছপালা হইতে প্রাণীর জন্ম হয়। জলে যে শেওলা দেখা যায়, তাহাকেই গাছপালা ও প্রাণীর পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া অনুমান করা হয়। পঞ্চাশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে শামুকের রাজত্ব ছিল; এক-একটি শামুক দশহাত পর্য্যন্ত লম্বা হইত। বার কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে সরীসৃপের প্রাধান্য ছিল; তাহাদের আকৃতি হাতীর চেয়েও বড় ছিল. তাহাদের মাথায় প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শিং ছিল। বর্ত্তমানকালের টিকটিকি, গিরগিটি ও গো-সাপ প্রভৃতি সেই অতিকায় জন্তুদেরই বংশধর। সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের পর মানুষের জন্ম হয়।]

ব্রহ্মাণ্ডের সব জিনিষেরই জন্ম-মৃত্যু আছে। আকাশে যে চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা তোমরা দেখিতে পাও, তাহাদেরও একদিন জন্ম

হইয়াছিল, আবার তাহাদের মৃত্যুও একদিন হইবে। আমরা যে পৃথিবীর উপর বাস করিতেছি, তাহাও একদিন হঠাৎ জন্মিয়াছিল, কতকাল পরে জানি না, তাহারও একদিন মৃত্যু হইবে। পণ্ডিতেরা নানা উপায়ে গণনা করিয়া পৃথিবীর জন্মের সময় ঠিক করিয়াছেন। তোমাদের কালো গাইটির কবে কোন্ সময়ে বাছুর জন্মিল, তাহা পাঁজি দেখিয়া ঠিক রাখা যায়। তা'র পরে কিছুদিন গেলে তাহার বয়স কত হইল, সূক্ষ্ম হিসাব করা চলে। পৃথিবী কবে জন্মিয়াছিল, তাহা কেহ লিখিয়া রাখেন নাই ; তাই এখন অনুমান করিয়া তাহার বয়স ঠিক করিতে হইতেছে। অনুমানের একটা দোষ এই যে, তাহাতে হিসাব সূক্ষ্ম হয় না ; মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যায় মাত্র। তাই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর বয়স ঠিক করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা সকলে একরূপ ফল পান নাই। একদল পণ্ডিত বলিতেছেন—"পৃথিবী জন্মিয়াছিল চারিশত কোটি বৎসর আগে।" আর এক দল বলিতেছেন—"দেড়শত কোটি বৎসর আগে।" সুতরাং আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমতে স্বীকার করিতে হয় যে, চারিশত কোটি বা দেড়শত কোটি বৎসর আগে কোনও একদিনে আমাদের এই পৃথিবী জন্মিয়াছিল।

তোমরা বোধ করি মনে কর যে, পৃথিবী তাহার পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-সমুদ্র, গাছপালা এবং জীবজন্তু বুকে করিয়াই জন্মিয়াছিল ; কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা তাহা বলেন না। তাঁহারা বলেন যে, এক প্রকাণ্ড জ্বলন্ত বাষ্পরাশির আকারে পৃথিবীর জন্ম হইয়াছিল। তখন তাহাতে গাছপালা, জীবজন্তু, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্ব্বত কিছুই ছিল না। কোটি-কোটি বৎসর ধরিয়া তাপ ছাড়িয়া যখন পৃথিবী ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিল, তখন একে-একে জমাট পৃথিবীর বুকে সমুদ্র, পাহাড়-

পর্ব্বত দেখা দিতে লাগিল। ইহার বহু পরে, কি রকমে জানি না, গাছপালার সৃষ্টি হইল। লক্ষ-লক্ষ বৎসর পৃথিবীতে গাছপালারই রাজত্ব চলিল। তা'র পরে একদিন প্রাণীর জন্ম হইল। কি-রকমে হইল, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে গাছপালা হইতেই যে প্রাণীর জন্ম, ইহা বুঝা যায়; কিন্তু প্রথমে যে প্রাণীর জন্ম হইয়াছিল, তাহার সহিত এখনকার কোন প্রাণীরই মিল নাই। পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেই প্রাথমিক প্রাণীই ক্রমে শরীর বদলাইয়া এখনকার নানা প্রাণীর চেহারা পাইয়াছে। মানুষও সেই প্রথম প্রাণী হইতেই উৎপন্ন; কিন্তু মানুষের জন্ম হইয়াছে সব জন্তু-জানোয়ারের জন্মের শেষে।

তোমরা হয়ত মনে করিতেছ, অতি প্রাচীনকালের এত খবর আমরা কোথা হইতে পাইলাম পৃথিবীর গর্ভে, অর্থাৎ মাটির তলায় যে কেবল সোনা, রূপা ও হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতু ও পাথর আছে, তাহা নয়। অতি প্রাচীনকালে যেসব গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ার পৃথিবীতে বাস করিত, তাহাদের দেহের অবশেষ এবং হাড়-গোড়ও মাটির তলায় পোঁতা আছে। বুদ্ধিমান্ মানুষ মাটি খুঁড়িয়া, পাথর কাটিয়া সেগুলি বাহির করিয়া পরীক্ষা করিতেছে। এই রকমে অতি প্রাচীনকালে, যখন মানুষ পৃথিবীতে জন্মে নাই, তখন পৃথিবীতে কি-রকম গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ার বাস করিত, তাহা জানা যাইতেছে। আমরা এই রচনাতে সেই আদিম যুগের কয়েকটি প্রাণীর পরিচয় দিব।

বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর মাটি খুঁড়িয়া ভূগর্ভে গাছপালা ও প্রাণীর কঙ্কাল স্তরে-স্তরে সাজান দেখিতে পাইয়াছেন। সে-সব গাছপালা ও প্রাণী এখন আর পৃথিবীতে নাই। এক-একটা স্তর

জমিতে যে-সময় লাগিয়াছিল, সেই সময়ে তাহারা পৃথিবীতে ছিল। পৃথিবীর প্রথম জীবনের স্তরগুলির কথা বলিব না। কারণ সে-সব স্তরে গাছপালা বা জন্তু-জানোয়ারের চিহ্নমাত্র ছিল না।

জীবের প্রথম জন্মলাভ হয় জলে। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, সেই জীবের চেহারা না জানি কত অদ্ভুত ছিল! কিন্তু তাহা নহে, আমরা এখন পুকুরের বদ্ধ জলে যে সবুজরঙের শেওলা (algae) দেখিতে পাই, তাহাই ঐ জলে জন্মিয়াছিল। উহাই গাছপালাদের পূর্ব্বপুরুষ এবং প্রাণীদেরও পূর্ব্বপুরুষ।

পঞ্চাশ কোটি বৎসর আগে পৃথিবীর উপরকার অবস্থা যে-রকম ছিল, মাটি খুঁড়িয়া বৈজ্ঞানিকেরা তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। পৃথিবীর উপরে পাহাড়-পর্ব্বত ও জল তখন উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু, শামুকজাতীয় প্রাণীর চেয়ে উচ্চশ্রেণীর প্রাণী তখন পৃথিবীতে জন্মে নাই। তখন পৃথিবীর উপরে শামুকেরই রাজত্ব ছিল। ইহাদের একটা লম্বায় দশহাত পর্য্যন্ত হইত। এগুলিকে আজকালকার অক্টোপাসের পূর্ব্বপুরুষ বলা যাইতে পারে।

প্রায় বারোকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে সরীসৃপের রাজত্ব ছিল। সরীসৃপের চেয়ে কোন উচ্চতর প্রাণী তখন পৃথিবীতে জন্মে নাই। সরীসৃপ কোন্ প্রাণীদের বলা হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা জান। এখন আমরা যাহাদের টিকটিকি, গিরগিটি ও গো-সাপ বলি, তাহারাই সরীসৃপ।

তখন গাছপালা বেশ বড় হইয়া জন্মিত এবং তাহারই মাঝে সরীসৃপজাতীয় প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড জানোয়ার বাস করিত। তাহাদের আকৃতি ছিল হাতীর চেয়েও বড় এবং চেহারা ছিল অতি বিশ্রী। শরীর এত বড় হইলেও তাহাদের বুদ্ধি ছিল নিতান্ত অল্প। মাথা ছিল

ছোট, সেইজন্য উহাদের বুদ্ধি ছিল না। বুদ্ধি কম বলিয়াই তাহারা পৃথিবীতে বেশিদিন রাজত্ব করিতে পারে নাই। তাহা না হইলে হয়ত আজও পৃথিবীতে সরীসৃপের রাজত্ব থাকিত, মানুষ জন্মাইত না। সেই অতিকায় জানোয়ারগুলির বংশধর এখন বুদ্ধির দোষে টিক্‌টিকি ও গিরগিটির মত ছোট প্রাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজকালকার সরীসৃপ নিরীহ প্রাণী। তাহারা হঠাৎ কাহারও অপকার করে না। আগেকার সরীসৃপেরা ছিল ভয়ানক দুষ্ট। তখন তাহাদের মাথায় প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শিং ছিল। তাহা দিয়া তাহারা পরস্পর মারামারি করিত এবং দুর্ব্বল প্রাণীদের অনিষ্ট করিত। বোধ করি, এই দুষ্টামির জন্যই তাহারা বেশিদিন পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে পারে নাই। দুর্ব্বল প্রাণীরা জোট বাঁধিয়া তাহাদের বংশ লোপ করিয়াছে।

অনুশীলনী

১। পৃথিবীর উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা কর।

২। পৃথিবীর প্রথম জীব কি? তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। বর্ত্তমান জগতের জীবের সঙ্গে তাহাদের কি সম্পর্ক আছে?

৩। প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ ও তাহাদের ক্রমবিবর্ত্তন-সম্বন্ধে যাহা জান, বল।

৪। ব্যাখ্যা কর—(ক) অনুমানের একটা দোষ···পাওয়া যায় মাত্র।
(খ) সেই অতিকায়···হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গঙ্গার শোভা

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গানদী ও তাহার তীরবর্ত্তী স্থানের দৃশ্য একটি অপরূপ সৌন্দর্য্যময় চিত্র। জাহাজে করিয়া যাইবার সময় গঙ্গার দুইধারে কবি যাহা দেখিয়াছেন, তাহা এখানে সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার সময় তরঙ্গহীন গঙ্গাবক্ষ হইতে তাহার দুইধারের যে অপরূপ দৃশ্য নয়ন-গোচর হয়, স্বর্গের নন্দন-কাননের সঙ্গেও তাহার তুলনা হয় কিনা, বলা কঠিন।]

শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা, এমন আর কোথায় আছে। গাছপালা, ছায়াকুটির— নয়নের আনন্দ অবিরল সারি-সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে— কোথাও বিরাম নাই।

কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে। কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্য্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে— জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে। কতকগুলি সূর্য্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে-মাঝে ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপর চিক্-চিক্ করিয়া উঠিতেছে। কোথাও বা একটা নৌকা তাহার কাছা-কাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে। সে সেই ছায়ার নীচে অবিশ্রাম জলের কুলুকুলু শব্দে মৃদু-মৃদু দোল খাইয়া বড় আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর এক পাশে বড়-বড় গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা-ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল

পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে। ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে।

প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কি শোভা! মানুষেরা যে এ-ঘাট বাঁধিয়াছে, তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশ্বত্থ গাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপর শেওলা পড়িয়াছে এবং তাহার রং চারিদিকে শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গিয়াছে! গ্রামের যে-সকল ছেলে-মেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে, তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতান আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেহ ইহার নাতি। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন একটুকু ছিল, তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই-চারিজন লোক আশেপাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই।

গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলির যেন বিশেষ কি মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেব-প্রতিমা নাই; কিন্তু সে নিজেই জটাজূট-বিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক-এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে জেলেদের নৌকা সারি-সারি বাধা রহিয়াছে; কতকগুলি জলে, কতকগুলি

ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে, তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়েঘরগুলি কিছু ঘন-ঘন, কাছাকাছি—কোন-কোনটা বাঁকাচোরা বেড়া-দেওয়া। দুই-চারিটি গরু চরিতেছে। গ্রামের দুই-একটি শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্ম্মার মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুনের ক্ষেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে।

হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোট-ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে-ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচ হইতে নদীস্রোত মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ি তাহার দু-চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে।

আবার আর একদিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশবন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে, তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে।

যে-কারণেই হউক, গঙ্গার ধারের ইটের পাঁজাগুলি আমার দেখিতে বেশ ভাল লাগে। তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না—চারিদিকে পোড়ো জায়গা এবড়ো-থেবড়ো—ইতস্তত: কতকগুলি ইট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ান—স্থানে-স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্ব্বরতা ও বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে!

গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে, সম্মুখে ঘাট; নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিতেছে। তাহার ঠিক
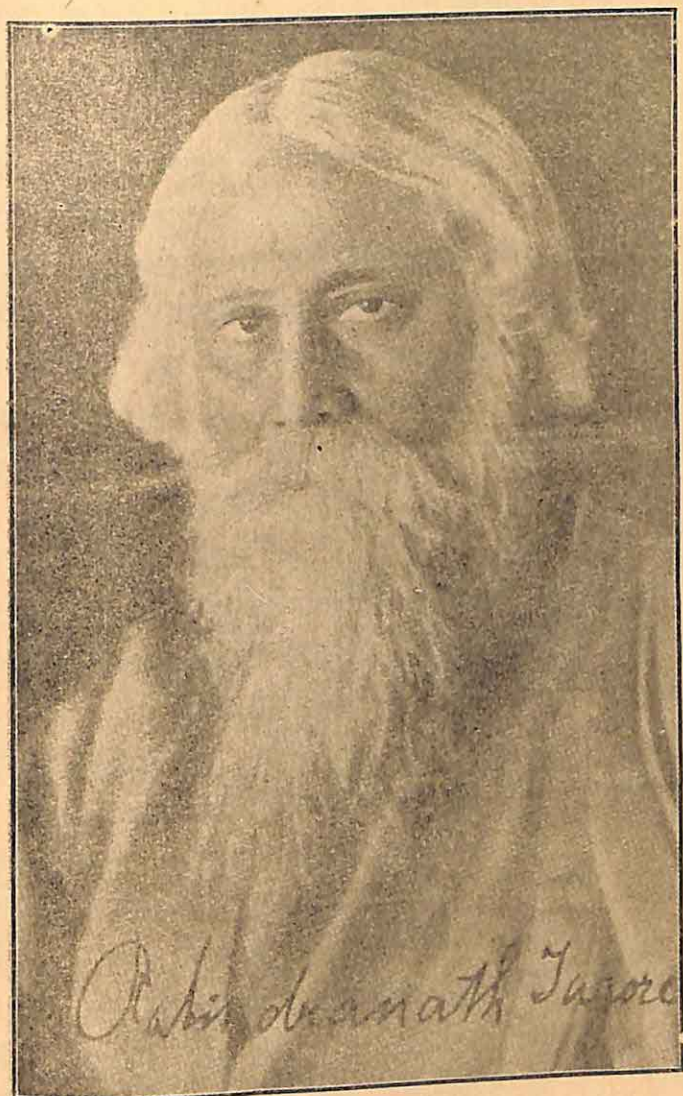
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট ধাপে-ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধান। আর দক্ষিণে কুমারদের বাড়ী, চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটীরের দেওয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার তক্‌তক্ করিতেছে—একদিকে মাচার উপর লাউ লতাইয়া উঠিতেছে, আর একদিকে তুলসীতলা।

সূর্য্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম-পাড়ের শোভা যে দেখে নাই, সে বাংলার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায়-ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে-আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থিরজলের উপরে লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্ব্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে-সমস্ত মিলিয়া ছায়া-পথের পরপারবর্ত্তী সুদূর শান্তিনিকেতনের একখানি ছবির মত পশ্চিম-দিগন্তের ধারটুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে-ওদিকে এক-একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে।

সহসা দক্ষিণের দিক্ হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়। কূলের উপরে অবিশ্রান্ত তরঙ্গ-আঘাতে ছল্-ছল্ শব্দ হইতে থাকে—আর কিছু ভাল দেখা যায় না, শোনা যায় না—কেবল ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ উঠে—আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে-নিভিতে থাকে।

আরো রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকারে অশ্বত্থগাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে-ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে।

নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান-চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো অন্ধকার-ঢাকা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে-তরঙ্গে ভাঙিয়া-ভাঙিয়া যায়। ও-পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আরও খানিকটা আলো পড়ে, সেইটুকু আলোতে ভাল করিয়া কিছু দেখা যায় না, কেবল ও-পারের সুদূরতা ও অস্পষ্টতাকে রহস্যময় করিয়া তোলে। এ-পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও-পারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

অনুশীলনী

১। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার যে অপরূপ সৌন্দর্য্য নয়নগোচর হয়, তাহা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর—(ক) তাহাদের দাদামহাশয়…পড়িয়া গিয়াছে।
(খ) কিন্তু সে নিজেই…পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।
(গ) এই অনুর্ব্বরতা…দাঁড়াইয়া থাকে।
(ঘ) সে-সমস্ত মিলিয়া…আঁকা দেখা যায়।
(ঙ) এ-পারে নিদ্রার রাজ্য…মনে হইতে থাকে।

বহুরূপী

(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

[শ্রীকান্ত তখন তাহার পিসিমার বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। একদিন রাত্রিতে শ্রীকান্ত এবং তাহার পিস্‌তুতো ভাইয়েরা পড়াশুনা করিতে বসিয়াছে, এমন সময় শ্রীনাথ বহুরূপী জানোয়ারের সাজ পরিয়া খেলা দেখাইতে আসিল। রাত্রির অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া সবাই মনে করিল যে, বাঘ আসিয়াছে। বাড়ীর দরজা বন্ধ হইয়া গেল, বাঘের সন্ধান লওয়ার সাহস কাহারও হইল না। পরে দুঃসাহসী ইন্দ্রনাথের চেষ্টায় সমস্যার সমাধান হইল।]

সেদিনটি আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রাম বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘন মেঘে
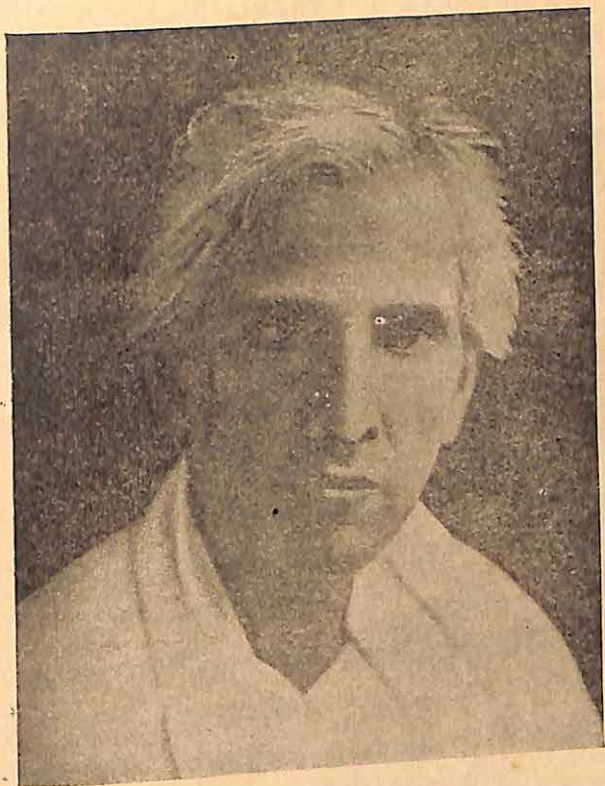
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক্ গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। আমরা তিন ভাই নিত্য-প্রথামত বাহিরে বৈঠকখানায় ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্য-তন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্‌চার্য অন্ধকারে ধূমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শোনা যাইতেছে এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই মেজদা'র কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটি 'হুম্' শব্দ এবং সঙ্গে-সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্ত্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ রৈ চীৎকার—"ওরে বাবারে, খেয়ে ফেল্লে রে।" কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্ব্বেই মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল।

এই সুযোগে একটি চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের বাড়ীর লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দ্বারওয়ানরা চোরকে মারিতে-মারিতে আধমরা করিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল।

"আরে, এ যে ভট্‌চাযি্য ম'শায়!"

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস দেয়।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভট্‌চায্যি মশায় কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন—"বাবা! বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক।"

'ছোড়দা' ও 'যতীনদা' বারবার কহিতে লাগিল—"ভালুক নয়, বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ।"

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না; কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত-নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

উঠানের এক প্রান্তে একটি ডালিম গাছ ছিল। অকস্মাৎ দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটি বৃহৎ জানোয়ার—বাঘের মতই বটে। চ'ক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল। জনপ্রাণী আর সেখানে নাই।

এমনি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ী ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে, বাঘ! বাঘ!"

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল; কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একাই নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে এই ডাকাত-ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসীমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাঁহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল—"দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয়, বোধ হয়।" তাহাদের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই

জানোয়ারটা থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গালা করিয়া কহিল—"না বাবুমশায়, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—শ্রীনাথ বহুরূপী।" ইন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্চায্যি মশাই খড়ম-হাতে সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন।

কিশোরী সিং তাহাকে সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া সে-ই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্চায্যি মশায় তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিলেন।

শ্রীনাথের বাড়ী বারাসতে। সে প্রতিবৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ-বাড়ীতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্চায্যি মশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল যে, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে, কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, আর সাহসে কুলাইল না।

শ্রীনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসীমা নিজে উপর হইতে কহিলেন—"তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে, সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমাদের দ্বারওয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর ক'রে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটি ছোটছেলের যা সাহস, একবাড়ী লোকের তা নেই!" পিসেমশায় কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসীমার এ-অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন

একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এ-সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন ; কিন্তু, স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়া পুরুষ মানুষের পক্ষে অপমানকর। তাই আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন—“উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও।” তখন তাহার সেই রঙ্গিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

অনুশীলনী

১। ‘বহুরূপী’ গল্পটি তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। “একটি ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ী লোকের তা' নেই।”—এই ছোটছেলেটি কে ? ‘বহুরূপী’ গল্পে তাহার সাহসিকতার কি পরিচয় পাইলে ?

৩। ব্যাখ্যা কর—তখন সেই·· দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল।

পাহাড়ে-জঙ্গলে

(বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

নিস্তব্ধ দুপুরে দূরে পাহাড় ও জঙ্গল অপূর্ব্ব রহস্যময় দেখাইত। কতবার ভাবিয়াছি, একবার গিয়া পাহাড়টা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিব, কিন্তু, সময় হইয়া উঠে নাই। শুনিতাম পাহাড়টি দুর্গম বনাকীর্ণ, শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা, বন-মোরগ, দুষ্প্রাপ্য বন্য চন্দ্রমল্লিকা ও বড়-বড় ভাল্লুক-ঝোড়ে ভর্ত্তি। পাহাড়ের উপর জল নাই বলিয়া বিশেষতঃ ভীষণ শঙ্খচূড় সাপের ভয়ে এ-অঞ্চলে কাঠুরিয়ারাও কখনও ওখানে যায় না।

দিক্‌চক্রবালে দীর্ঘ নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে ও সন্ধ্যায় মনে কত স্বপ্ন আনে। একে তো এদিকের সারা অঞ্চলটাই আজকাল আমার কাছে পরীর দেশ

বলিয়া মনে হয়, এর জ্যোৎস্না, এর ঘন-বনানী, এর নির্জ্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য্য, এর মানুষ-জন, পাখীর ডাক, বন্য-ফুলশোভা—সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কোথাও কখনও পাই নাই।

একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম। নয়মাইল ঘোড়ায় গিয়া দুইদিকের শৈলশ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলি। দুইদিকের শৈলসানু বনে ভরা, পথের ধারে দুইদিকের বিচিত্র ঘন বন-ঝোপের ভিতর দিয়া সরু পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে, কখনও উঁচুনীচু, মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট পার্ব্বত্য-ঝর্ণা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে। বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই, কারণ তখন শরৎকাল, চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয়; কিন্তু, কি অজস্র বন্য-শেফালিবৃক্ষ বনের সর্ব্বত্র ফুলের খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে—বৃক্ষতলে, শিলাখণ্ডে, ঝর্ণার উপলাকীর্ণ তীরে! আরও কত কি বিচিত্র বন্যপুষ্প ফুটিয়াছে বর্ষাশেষে—পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বন, অর্জ্জুন ও পিয়াল; নানাজাতীয় লতা ও অর্কিডের ফুল—বহুপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র মিলিয়া মৌমাছিদের মত মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া তুলিতেছে।

এতদিন এখানে আছি, এই সৌন্দর্য্যভূমি আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। এখানকার জঙ্গল ও পাহাড়কে দূর হইতে ভয় করিয়া আসিয়াছি, বাঘ আছে, সাপ আছে, ভাল্লুকের নাকি লেখা-জোখা নাই—এ-পর্য্যন্ত তো একটা ভাল্লুক-ঝোড় কোথাও দেখিলাম না। লোকে যতটা বাড়াইয়া বলে, ততটা নয়।

ক্রমে পথটার দু'ধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে যেন দু'-দিক্ হইতে চাপিয়া ধরিল। বড়-বড় গাছের ডালপালা পথের উপর

চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করিল। ঘন-সন্নিবিষ্ট কালো-কালো গাছের গুঁড়ি, তাহাদের তলায় কেবলই নানাজাতীয় ফার্ণ, কোথাও বড়গাছেরই চারা। সামনে চাহিয়া দেখিলাম, পথটা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে, বন আরও কৃষ্ণায়মান, সামনে একটা উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া; তাহার অনাবৃত শিখরদেশের অল্প নীচেই যেসব বন্যপাদপ আছে, এত নীচু হইতে সেগুলি দেখাইতেছে, যেন ছোট-ছোট শেওড়া-গাছের ঝোপ। অপূর্ব্ব গম্ভীর শোভা এই জায়গাটার। পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপর অনেক দূর উঠিলাম, আবার পথটা নামিয়া গড়াইয়া গিয়াছে; কিছুদূর নামিয়া আসিয়া একটা পিয়াল-তলায় ঘোড়া বাঁধিয়া শিলাখণ্ডে বসিলাম; উদ্দেশ্য—শ্রান্ত অশ্বকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া।

চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝর্‌ণার কলমর্ম্মর সেই শৈলমালাবেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারিধারেই উঁচু-উঁচু শৈলচূড়া, তাহাদের মাথায় শরতের ঘন নীল আকাশ। কত কাল হইতে এই বন ও পাহাড় এই একরকমই আছে। সুদূর অতীতে আর্য্যেরা খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখন এই রকমই ছিল; বুদ্ধদেব তরুণী পত্নী ও শিশুপুত্রকে ছাড়িয়া যে-রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীত রাত্রিটিতে এই গিরিচূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকে আজকালের মতই হাসিত। তমসাতীরের পর্ণকুটীরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখিতে-লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন—সূর্য্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্তমেঘস্তূপের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, আশ্রম-মৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে,

সেদিনটিতেও পশ্চিম-দিগন্তের শেষ রাঙ্গা আলোয় এই শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়াছিল—আজ আমার চোখের সামনে ধীরে-ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কতকাল আগে, যেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন, গ্রীকরাজদূত হেলিওদোরস্ গরুড়ধ্বজস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন; রাজকন্যা সংযুক্তা যেদিন স্বয়ংবরসভায় পৃথ্বীরাজের মূর্ত্তির গলায় মাল্যদান করেন; চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্ত্তন করেন; যে দিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—ঐ শৈলচূড়া, এই বনানী ঠিক এমনি ছিল। তখন কাহারা বাস করিত এইসব জঙ্গলে?

অতীত কোনদিনে, এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র—প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত সে-যুগের এই বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট্ পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।

এই বালুস্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্তৃত অতীতে মহাসমুদ্রে বিক্ষুদ্ধ ঊর্ম্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট চিহ্ন—ভূ-তত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ তখন ছিল না, এ-ধরণের গাছপালাও ছিল না; যে-ধরণের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তা'রা তা'দের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে, যে-কোন মিউজিয়মে গেলে দেখা যায়।

অনুশীলনী

১। বিভূতিভূষণ 'পাহাড়ে-জঙ্গলে'-শীর্ষক নিবন্ধে পার্ব্বত্য প্রদেশের যে সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর :—(ক) দিক্‌চক্রবালে দীর্ঘ…কত স্বপ্ন আনে।
(খ) বুদ্ধদেব তরুণী…মতই হাসিত।
(গ) তমসাতীরের…হইয়া আসিতেছে।
(ঘ) যেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম…ঠিক এমনই ছিল।
(ঙ) অতীত কোনদিনে…স্বপ্ন দেখিলাম।

মন্ত্রের সাধন

(আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু)

[একনিষ্ঠ সাধনা ও সহিষ্ণুতার বলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া উঠে, কোন চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না; জগতের ক্রমোন্নতির মূলে বহু লোকের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চেষ্টা রহিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি অগণ্য প্রবাল-কীটের দেহ দ্বারা নির্ম্মিত। 'ব্যাঙ্-নাচানো' অধ্যাপক গ্যাল্‌ভ্যানির আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তর আনিল, জার্ম্মান-বৈজ্ঞানিক সোয়ার্জের চেষ্টায় উড়োজাহাজ আবিষ্কৃত হইল ; পৃথিবীর সমস্ত স্থানের ব্যবধান দূর হইল।]

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এই দ্বীপগুলি অতি রুদ্র প্রবাল-কীটের পঞ্জরে নির্ম্মিত। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া অগণ্য কীট নিজ-নিজ দেহ দ্বারা এই দ্বীপগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

আজকাল বিজ্ঞানের দ্বারা যে-সকল অসাধ্য-সাধন হইতেছে, তাহাও বহু লোকের ক্ষুদ্রচেষ্টারই ফলে। মানুষ পূর্ব্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর যে মনুষ্য বর্ত্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কে প্রথমে আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, কে প্রথমে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কৃত করিল, তাহা আমরা কিছুই

জানি না। এইমাত্র জানি যে, প্রথমে যাঁহারা কোন নূতন প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পদে-পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে অনেক নির্য্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরেও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাততঃ মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে; কিন্তু কোন চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুইদিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

একশত বৎসর পূর্ব্বে ইতালিদেশে গ্যাল্‌ভ্যানি নামে একজন অধ্যাপক দেখিতে পাইলেন যে, লোহা ও তামার তার দিয়া একটা মরা ব্যাঙ্‌কে স্পর্শ করিলে ব্যাঙ্‌টা নড়িয়া উঠে। তিনি অনেক

বৎসর ধরিয়া এই ঘটনাটির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া এত সময় অপব্যয় করিতে দেখিয়া লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। তাঁহার নাম হইল 'ব্যাঙ্‌-নাচানো' অধ্যাপক। বন্ধুরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"মরা ব্যাঙ্‌ যেন নড়িল, কিন্তু ইহাতে লাভ কি?"

কি লাভ? সেই সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিদ্যুতের বিবিধ গুণ-সম্বন্ধে নূতন-নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। এই একশত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ দ্বারা পথঘাট আলোকিত হইতেছে, গাড়ী চলিতেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটি যেন আমাদের ঘরের কোণে আসিয়াছে—দূর আর দূর নাই। আমাদের কণ্ঠস্বর বাড়ীর এক-দিক্ হইতে অন্যদিকে পৌঁছিত না; এখন বিদ্যুতের বলে সহস্র ক্রোশ দূরের বন্ধুর সহিত আমরা কথাবার্ত্তা বলিতেছি।

মনুষ্য এ-পর্য্যন্ত পৃথিবীর এবং সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু বহুদিন আকাশ জয় করিতে পারে নাই। ব্যোমযানে শূন্যে উঠা যায় বটে, কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে বেলুন চলিতে পারে না। আর এক অসুবিধা এই যে, বেলুন হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্যাস বাহির হইয়া যায়, এজন্য বেলুন অধিকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না।

রেশমের আবরণ হইতে গ্যাস বাহির হইয়া যায় বলিয়া বেলুন অধিকক্ষণ আকাশে থাকিতে পারে না। সোয়ার্জ্‌ নামে একজন জার্ম্মান এইজন্য এলুমিনিয়ম্ ধাতুর বেলুন প্রস্তুত করেন। এলুমিনিয়ম্ কাগজের ন্যায় হাল্কা, অথচ ইহা ভেদ করিয়া গ্যাস

বাহির হইতে পারে না। বেলুন যে ধাতুনির্ম্মিত হইতে পারে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিল না। সোয়ার্জ্ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুবৎসরব্যাপী নিষ্ফল চেষ্টার পর অবশেষে বেলুন নির্ম্মিত হইল। বেলুন যাহাতে ইচ্ছানুক্রমে বাতাসের প্রতিকূলে যাইতে পারে, এজন্য সোয়ার্জ্ একটি ক্ষুদ্র এঞ্জিন প্রস্তুত করিলেন; জাহাজে যেমন জলের নীচে স্ক্রু থাকে, এঞ্জিনের স্ক্রু ঘুরাইলে জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে, সেইরূপ বাতাস কাটিয়া চলিবার জন্য একটি বড় স্ক্রু তিনি নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু বেলুন নির্ম্মিত হইবার অল্প পরেই সোয়ার্জের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তিনি যাহার জন্য সমস্ত সম্পত্তি ও জীবন পণ করিয়াছিলেন, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিলেন না, এতদিনের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে চলিল।

সোয়ার্জের সহধর্ম্মিণী তখন জার্ম্মান-গভর্ণমেণ্টের নিকট বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। জার্ম্মান-গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধে ব্যোমজান ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু সোয়ার্জের বেলুন যে কখনও আকাশে উঠিতে পারিবে, কেহ তাহা বিশ্বাস করিল না। কেবল বিধবার দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া সেই বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধবিভাগের কতিপয় অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বেলুন দেখিবার জন্য বহুলোক আসিল। পরীক্ষকেরা আসিয়া দেখিলেন, বেলুনটি অতি প্রকাণ্ড এবং ধাতুর নির্ম্মিত বলিয়া রেশমের বেলুন অপেক্ষা অনেক ভারী। তারপর বেলুন চালাইবার জন্য এঞ্জিন ও অনেক কল বেলুনে সংযুক্ত রহিয়াছে। এরূপ প্রকাণ্ড জিনিষ কি কখনও আকাশে উঠিতে পারে? পরীক্ষকেরা একে অন্যের সহিত বলাবলি করিতে লাগিলেন

—"এই অদ্ভুত কল কোনদিনও পৃথিবী ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। লোকটি মরিয়া গিয়াছে; আর তাহার বিধবা অনেক আশা করিয়া দেখাইতে আসিয়াছে, সুতরাং অন্ততঃ নামমাত্র পরীক্ষা করিতে হইবে, তবে বেলুনের সহিত অতগুলি কল ও জঞ্জাল রহিয়াছে; এগুলি কাটিয়া বেলুনটিকে একটু হাল্কা করিলে হয় ত দুই-চারি হাত উঠিতে পারে।" হায়! তাহাদিগকে বুঝাইবার কেহ ছিল না। বেলুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার স্বর আর শুনা যাইবে না। যে-সমস্ত কল অনাবশ্যক বলিয়া কাটিয়া ফেলা হইল, তাহা আবিষ্কার করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। ঐ কলগুলির দ্বারা বেলুনকে ইচ্ছানুক্রমে দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধে ও অধোদিকে চালিত করা যাইত।

ইহার পর আর এক বাধা পড়িল। সোয়ার্জের অবর্ত্তমানে বেলুন কে চালাইবে? অপরে কি করিয়া কলের ব্যবহার বুঝিবে? সে যাহাই হউক, দর্শকদিগের মধ্যে একজন ইঞ্জিনিয়ার সাধ্যমত কল চালাইতে সম্মত হইল। অদূরে বিধবা কলের প্রত্যেক স্পন্দন গণিতেছিলেন।

বেলুন পৃথিবী হইতে উঠিতে পারিবে কি? কল চালান হইল, অমনি বেলুন পৃথিবী ছাড়িয়া মহাবেগে শূন্যে উঠিল। তখন বাতাস বহিতেছিল, কিন্তু প্রতিকূল বাতাস কাটিয়া বেলুন ছুটিল। এতদিনে সোয়ার্জের চেষ্টা সফল হইল; কিন্তু লোকেরা যে-সব কল অনাবশ্যক মনে করিয়াছিল, স্বল্পকালের মধ্যে তাহার আবশ্যকতা প্রমাণিত হইল। বেলুন আকাশে উঠিল বটে, কিন্তু তাহা সাম্‌লাইবার কল না থাকাতে অল্পক্ষণ পরেই ভূমিতে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

এই দুর্দ্দশাতে সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সোয়ার্জ্ যে অভিপ্রায়ে বেলুন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনদিন নিশ্চয়ই

সফল হইবে। দশবৎসরের মধ্যেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। জেপলিন যে ব্যোমযান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রথম মহাযুদ্ধে ভীষণ মহামারীর সৃষ্টি করিয়াছিল। যুদ্ধের পর এই ব্যোমযান আট্‌লান্টিক মহাসাগর অনায়াসে পার হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে।

অনুশীলনী

১। একনিষ্ঠ সাধনা ও সহিষ্ণুতার বলে কিভাবে অসাধ্য-সাধন হইতে পারে, 'মন্ত্রের-সাধন' প্রবন্ধটি আলোচনা করিয়া তাহা বুঝাইয়া দাও।

২। গ্যাল্‌ভ্যানি কে ছিলেন? তিনি কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন? সেই আবিষ্কারের ফলে জগতের কি উন্নতি হইয়াছে?

৩। সোয়ার্জ্‌ কে ছিলেন? তাঁহার আবিষ্কার ও তাহার ফলাফল বর্ণনা কর।

৪। 'আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুইদিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।'—দুইটি উদাহরণ দিয়া এই উক্তিটি বুঝাইয়া দাও।

৫। বিদ্যুতের কার্য্য বর্ণনা কর।

৬। ব্যাখ্যা কর—(ক) বুদ্ধি, চেষ্টা···পৃথিবীর রাজা হইয়াছে।
(খ) সমস্ত পৃথিবীটি যেন···দূর আর দূর নাই।
(গ) তাহার পর হইতে···ঘুচিয়া গিয়াছে।

দেশের কথা

(দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ)

[বাঙ্গালীর নিজস্ব সাধনা ও ধর্ম্ম, দর্শন ও বীরত্ব প্রভৃতির মধ্যে একটা গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু কয়েকটি দোষের ফলে আমরা অত্যন্ত অধঃপতিত হইয়াছি। কৃষিকার্য্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি না থাকায় শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালায় আজ দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রসারের ফলে অশিক্ষিত কৃষক ও মজুরদের সঙ্গে এক বিরাট্ ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই আপামর-সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আপনার জন বলিয়া মনেই করিতে পারে না। জাতীয় সংস্কৃতির প্রসারের দ্বারা এই ব্যবধান দূর করিলে তবেই আমাদের উন্নতি হইবে।]

বাঙ্গালী যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটা অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি; বাঙ্গালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাঙ্গালাকে জানে না; কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যাক্ যে, বাঙ্গালীর কতকগুলি দোষ আছে, যাহার সংশোধন আবশ্যক, বাঙ্গালীকে পূরাপূরি মানুষ করিয়া তোলাই বাঙ্গালীর চেষ্টা বা চিন্তার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আমাদের চাষীদের চাষের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভাল করিয়া লইতে হইলে আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, কেন আমাদের পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া অনেক লোক শহরে আসিয়া বাস করে, কারণ অনুসন্ধান করিতে

হইলে বিচার করিতে হইবে যে, সে কি পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের জন্য, কি অন্য কোন কারণে? সেই সঙ্গে অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালীর উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের গ্রামের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও আবশ্যক।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

সেই সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে যত চাষযোগ্য জমি আছে, সব ভাল করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা সহজ ও সচ্ছল হয় কি না। যদি না হয়, তবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।

এইসব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের চাষের প্রণালী কিরূপ ছিল, আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, কেমন করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতাম, এইসব কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

শুধু তাহাই নহে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইবে। কেমন করিয়া শিক্ষা-বিস্তার করিতাম, কেমন করিয়া আমরা আপনাকে শিক্ষিত করিয়া লইতাম এবং এখন বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের শিক্ষাপ্রণালী কি রকম হওয়া উচিত, এইসব কথারও বিচার আবশ্যক।

শুধু তাহাই নহে, আমাদের কৃষিকার্য্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আমাদের সমাজের কি সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাতে আমাদের কতটা উপকার, কতটা অপকার সাধিত হইতেছে, এ-কথাকেও তাচ্ছিল্য করা যায় না। কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কি সম্বন্ধ থাকা উচিত, কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে?

শুধু ইহাই নহে, আমাদের কৃষিকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড়-বড় সামাজিক আচার-ব্যবহার পর্য্যন্ত, আমাদের সকল ভাব, সকল ভাবনা, সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে তাহাদের ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তাহার বিচার অবশ্য-কর্ত্তব্য। সেদিকে চোখ না রাখিলে সবদিক্‌ই যে অন্ধকার দেখিব। সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।

আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন; কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশী বিপদ্ যে, আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার-

ব্যবহারে অনেকটা পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। বিলাতের জিনিষটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচি। এদেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কি না, তাহা একবারও ভাবি না। কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি, ইউরোপে রাজনীতির যত কেতাব-কোরানে যত ধারাল বাক্য আছে, একেবারে একনিঃশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি, এবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম। মনে করি, আমরা তর্ক করিয়াও বক্তৃতা করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধার-করা কথার ভার চাপাইয়া দিই। যাহা সম্ভবতঃ সহজ ও সরল, তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক, তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না, বাঙ্গালার কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্ব্বতোভাবে তুচ্ছ করি, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করি না।

আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি ? আমরা কয় জন ? দেশের আপামর-সাধারণের সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায় ? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাহাই ভাবে ? সত্যকথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীর সেরূপ আস্থা নাই ? কেন নাই ? আমরা যে ভিতরে-ভিতরে অতিরিক্ত পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন হইয়াছি! আমরা যে ইংরেজী পড়ি ও ইংরেজীতে ভাবি এবং ইংরেজী তর্জ্জমা করিয়া বাঙ্গালা বলি ও লিখি, তাহারা আমাদের কথা বুঝিতে পারে না।

তাহারা মনে করে, নকলের চেয়ে আসলই ভাল। আমরা যে

তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি ? গভর্ণমেণ্টের কাছে কোনও আবেদন করিতে হইলে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া একটা বিরাট্ সভার আয়োজন করি, কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি ? কোন্ কাজ তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া বা তাহাদের মত লইয়া করি ? যদি না করি, তবে কেন অবনতমস্তকে আমাদের ত্রুটি স্বীকার করিব না ? কেন সত্য কথা বলিব না ? মিথ্যার উপর কোনও সত্য বা স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের জাতীয় উন্নতি সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাঙ্গালাকে সবদিক্ দিয়াই দেখিতে হইবে যে, বাঙ্গালার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ইংরেজ যখন প্রথম আমাদের দেশে আসে, তখন নানাকারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্ব্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালার হিন্দুর সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চিরকীর্ত্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী। বাঙ্গালার হিন্দুর জীবনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপে কি ধর্ম্মে, কি জ্ঞানে বাঙ্গালার হিন্দু তখন সর্ব্ববিষয়ে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দ্দী খাঁর পর হইতেই বাঙ্গালার মুসলমানও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই সময়ে তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল।

এমন সময়ে এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরেজ বণিক্‌বেশে আগমন করিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যস্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয়-দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন

আমরা ইংরেজ-রাজত্বের সঙ্গে-সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতারও বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম দুর্ব্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল। পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহবশতঃ আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া সুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় নাই।

অনুশীলনী

১। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী জাতির উন্নতির কি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ?

২। ব্যাখ্যা কর—(ক) বিলাতের জিনিষটা ··পারিলেই বাঁচি।

(খ) তাই বলিতেছিলাম · করিতে হইবে।

(গ) বাঙ্গালার হিন্দুর···হইয়া গিয়াছিল।

(ঘ) সেই সময়ে ভাসিয়া গিয়াছিল।

(ঙ) অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত···ঝুঁকিয়া পড়িলাম।

বাঙ্গালার যুব-জাগরণ

(উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

[স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে বাঙ্গালার যুবকদের মধ্যে একটা নব-জাগরণের সাড়া জাগিয়া উঠে, দেশাত্মবোধ জাগরিত হইয়া বাঙ্গালার যুব-সম্প্রদায় স্বাধীনতা-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। বাঙ্গালার এই নব-জাগরিত শক্তিকে দ্বিধা-বিভক্ত করিবার জন্যই লর্ড কার্জ্জন বঙ্গভঙ্গের আয়োজন করেন; কিন্তু সেই শক্তি বিভক্ত হইল না; বরং তাহার বিচ্ছুরিত অগ্নিকণা সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের গোড়াপত্তন করিয়া দিল।]

১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর সমস্ত বাঙ্গালাদেশ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বরোদায় অরবিন্দের নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল, তখন তিনি বুঝিলেন যে, বাঙ্গালার শিয়রে যিনি জাগ্রৎ প্রহরীর মত ছিলেন এবং যাঁহার কার্য্য সবেমাত্র সুরু হইয়াছিল, সেই কর্ম্মযোগী বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বাঙ্গালাকে পথ দেখাইবার আর কেহ নাই। বিবেকানন্দের ভাবধারা, তাঁহার সেবাধর্ম্মের আদর্শ, তাঁহার স্বদেশ-প্রেম শ্রীঅরবিন্দের তরুণ-চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সন্ন্যাসী হইয়াও এই মানুষটির সুগভীর দেশাত্মবোধ দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জাতির সম্মুখে এই জীবন্ত আদর্শ যতদিন থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালার পক্ষে নিরাশ হইবার কিছুই নাই; কিন্তু তাঁহার আকস্মিক তিরোধান সুদূর প্রবাসে শ্রীঅরবিন্দকে মুহ্যমান করিয়া দিল। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের প্রিয়তম আদর্শ। তাহার প্রমাণ—তিনি বলিতেন—"বিরাট্ প্রাণ-

পুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—নরকেশরী বিবেকানন্দ।”

শ্রীঅরবিন্দ আর নিষ্ক্রিয় হইয়া অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। সুদূর প্রবাস হইতেই তিনি যেন বঙ্গমাতার শোকবিহ্বল কণ্ঠের করুণ আহ্বান শুনিতে পাইলেন। সেই সময় বরোদার রাজার দেহরক্ষী ছিলেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে কয়েকখানি ‘ভবানী-মন্দির’ দিয়া বাঙ্গালায় বিপ্লবী-দল গঠন করিতে পাঠাইলেন। যতীন্দ্রনাথকে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ সরলা দেবী ও প্রমথনাথ মিত্রকে নির্দ্দেশ দিলেন। সরলা দেবী যতীন্দ্রনাথকে ‘তরুণ-সঙ্ঘ’ নামে একটি গুপ্ত সমিতি-স্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। প্রমথ মিত্র মহাশয় কিন্তু গুপ্ত-সমিতি-স্থাপনে স্বীকৃত হইলেন না। তাই তিনি ‘অনুশীলন-সমিতি’ নাম দিয়া একটি প্রকাশ্য সমিতি স্থাপন করিয়া ছেলেদের যাহাতে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা লাঠি ও ছোরা-খেলায় যাহাতে দক্ষ হয়, সেই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য যতীন্দ্রনাথকে বলিলেন।

বাঙ্গালায় শক্তিচর্চ্চার আয়োজন সুরু হইল। প্রমথবাবুর সাহায্যে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রথম ‘অনুশীলন-সমিতি’ স্থাপিত হয়। যতীন্দ্রনাথ এই সমিতির সভ্যগণের সহিত পরিচিত হইলেন। পরে তিনি মেদিনীপুরে গিয়া শ্রীঅরবিন্দের মাতুল শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁহার অগ্রজ জ্ঞানবাবুর নেতৃত্বে ‘যুব-সঙ্ঘ’, ‘তরুণ-সঙ্ঘ’ ও ‘ভবানী-মন্দির’ প্রভৃতি নামে মেদিনীপুরের স্থানে-স্থানে একাধিক গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করিলেন।

বরোদায় থাকিলেও এই সময় শ্রীঅরবিন্দের প্রাণ পড়িয়া ছিল বাঙ্গালায়, দৃষ্টি ছিল বাঙ্গালার দিকে, চিন্তা ছিল বাঙ্গালাকে কেন্দ্র করিয়াই। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী না উঠিলে ভারতবাসীর উত্থান অসম্ভব। বরোদায় থাকিয়া তিনি যতীন্দ্রনাথের কার্য্যের বিবরণ পাইতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন যে, দেশে কিছু সাড়া পড়িয়াছে। এখন কাজের গতি বর্দ্ধিত করিবার এবং আরও প্রেরণা সঞ্চার করিবার প্রয়োজন। এই ভাবিয়া ১৯০৩ সালের প্রথমেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার অনুজ বারীন্দ্রকে যতীন্দ্রনাথের সহকারী-হিসাবে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। সংগঠনী-প্রতিভা-সম্পন্ন বারীন্দ্রকুমার কলিকাতায় আসিয়া প্রমথনাথ মিত্রের সহিত প্রথমে পরিচিত হইলেন। তাহার পর চলিল অনুশীলন-সমিতির উন্নতির জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম।

ক্রমে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাসে স্বদেশপ্রেমের সুর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আভাসে-ইঙ্গিতে একটা নব-জাগরণের সূচনা দেখা দিতে লাগিল। বাঙ্গালার অন্তরে একটা আলোড়ন ভাবী বিপ্লবের সঙ্কেত বহন করিয়া আনিল। পরম উৎসাহে বারীন্দ্র বাঙ্গালার নানাস্থানে ঘুরিয়া 'গুপ্ত-সমিতি'-স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বত্রই যে সাড়া পাইলেন, তাহা নহে। বরং অনেক স্থানে তাঁহাকে বিফল-মনোরথ হইতে হইল। সারা বাঙ্গালাদেশে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি মাত্র অল্প কয়েকটি যুবক পাইলেন, যাহারা শিবাজী ও আনন্দমঠের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত।

তখনও পর্য্যন্ত এইসব ব্যাপারে বাঙ্গালার মুসলমান-সম্প্রদায় কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই। তাহার অন্যতম কারণ, তাহাদের মধ্যে ইংরেজী-শিক্ষা তখনও বিশেষ বিস্তার লাভ করে

শ্রীঅরবিন্দ

নাই। নবীন বাঙ্গালার হিন্দু-যুবকেরা অগ্রসর হইয়া মুসলমান-ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিল।

বাঙ্গালায় যখন যুবকদের মধ্যে এইরকম একটা সঙ্ঘবদ্ধ ভাব দেখা দিল, একটা নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে যখন কর্ম্মের স্পৃহা জাগিয়া উঠিল, রাজশক্তি তখনই প্রমাদ গণিলেন। যুবকদের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ তাঁহারা সন্দেহের চ'ক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বত্র তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। এইসকল যুবকের উপর যখন পুলিশের দৃষ্টি পড়িল, তখন তাঁহারা সংগৃহীত বন্দুক ও রিভলবার প্রভৃতি সরাইয়া ফেলিলেন এবং রাজনীতিক-কৌশল-হিসাবে আপাততঃ সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

তখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা লর্ড কার্জ্জন; তিনি বাঙ্গালার যুবকদের এই প্রকার জাগরণ দেখিয়া তাহাদের জাতীয়ভাবোধকে বিপর্য্যস্ত করিবার নানারকম কৌশল আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যই যে বাঙ্গালীর ঐক্যের কারণ, তাহা তিনি ভালরূপে বুঝিয়া ফেলিলেন। অগত্যা বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ করিবার জন্য তিনি ১৯০৪ সালে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ্ অ্যাক্ট পাস করিলেন; কিন্তু তৎকালীন ভাইস্-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বুদ্ধিবলে বাঙ্গালীর শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল না। লর্ড কার্জ্জন যখন দেখিলেন যে, বাঙ্গালীর শিক্ষার পথ রুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীকে হীনবল করা যাইবে না, তখন তিনি বাঙ্গালাকে বিভক্ত করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদায় বসিয়া লর্ড কার্জ্জনের কার্য্য-কলাপের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ হইলে তাঁহার

কাজ যে প্রত্যেক ভারতবাসীর কাজ হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য বাঙ্গালায় যে প্রাথমিক প্রস্তুতি, ইহা যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যুবকদের অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে এবং উপরের নিস্তরঙ্গ কর্ম্মপ্রবাহ ভিতরে-ভিতরে আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতা-আন্দোলনের ভিত্তিকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতেছে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা যে আজ বাঙ্গালার মুষ্টিমেয় যুবকদের অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়াছে, ইহারই জ্যোতির্ম্ময় দ্যুতি নিকট-ভবিষ্যতে সারা ভারতেবিচ্ছুরিত হইবে।

অনুশীলনী

১। শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে বাঙ্গালার যুব-জাগরণ-সম্বন্ধে যাহা জান বল।

২। 'অনুশীলন-সমিতি'-সম্বন্ধে কি জান?

৩। ব্যাখ্যা কর—(ক) বাঙ্গালায় যখন·· প্রমাদ গণিলেন।

(খ) তিনি বুঝিলেন·· বিচ্ছুরিত হইবে।

পদ্যাংশ

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি

(কৃত্তিবাস ওঝা)

[পিতৃসত্য-পালনের জন্য রামচন্দ্র যখন বনগমন করেন, তখন ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন। রাজ্যে ফিরিয়া যখন তিনি এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তিনি পিতৃসত্য-পালনের জন্যই বনে আসিয়াছেন এবং চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলেই আবার অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবেন।]

আজ্ঞা পেয়ে রথ তবে জোগায় সারথি।
ভরত আনিতে রামে যান শীঘ্রগতি॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে আছেন রঘুবর।
শুনিয়া ভরত তথা হন অগ্রসর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্ম্মাইয়া পর্ণশালা॥
হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশে।
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে॥
গলবস্ত্র ভরত, নয়নে বহে নীর।
তীর্থ-পর্য্যটনে অতি মলিন শরীর॥
পড়িলেন শ্রীরামের চরণ-কমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তাঁ'রে লইলেন কোলে॥

ভরত কহেন ধরি' রামের চরণ ।
"কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি' বনে আগমন ?
বামা-জাতি স্বভাবতঃ বামা-বুদ্ধি ধরে ।
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে ?
অপরাধ ক্ষমা কর, চল প্রভু দেশ ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ ॥
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার ।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার ॥
চল প্রভু, অযোধ্যায়, লহ রাজ্যভার ।
দাসবৎ কর্ম্ম করি আজ্ঞা-অনুসার ॥"
শ্রীরাম বলেন—"তুমি ভরত, পণ্ডিত ।
না বুঝিয়া হেন বল, এ নহে উচিত ॥
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বমাতায় ।
বনে আইলাম আমি পিতার আজ্ঞায় ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য ।
অযোধ্যা যাইব আমি, দেখিবা প্রত্যক্ষ ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম্ম লিখ ।
২। রামচন্দ্র ও ভরতের কথোপকথনের সার সঙ্কলন কর ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
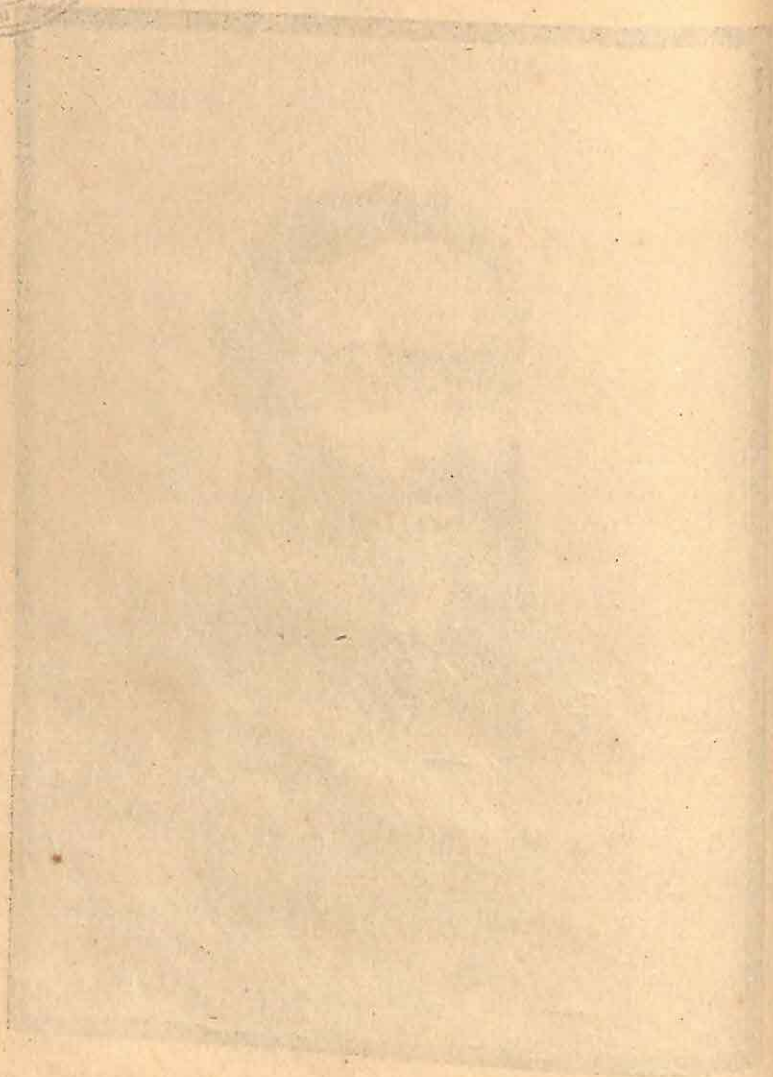
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্র-ধাত্রি ! চল সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্-জন,
কেমনে প'ড়েছে রণে বীরচূড়ামণি
বীরবাহু ; চল দেখি জুড়াই নয়নে ।”
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী । চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন—
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহর পুরী ।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা । তাহার উপরে
বীরমদে মত্ত ফেরে অস্ত্রীদল যত
ভীমসম । অদূরে হেরিলা রক্ষপতি
রণক্ষেত্র ! শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে ।
প'ড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ;
চূর্ণরথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক, পড়ি যায় গড়াগড়ি ।
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, প'ড়েছিল যথা,
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠ-ধারী,
এড়িলা একঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে ।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ—
“যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার

প্রিয়তম, বীরকুল-সাধ এ শয়নে
সদা। রিপুদলে বলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে !
তবু বৎস, যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে-জন,
অন্তর্য্যামী যিনি, আমি কহিতে অক্ষম।”

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম লিখ। ২। রাবণের উক্তির সার-সঙ্কলন কর।
৩। যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্যটি বর্ণনা কর।
৪। ব্যাখ্যা কর —(ক) ডমরুধ্বনি শুনি·· নিবাসে বিবরে ?
(খ) অদূরে হেরিলা···ফেরে কোলাহলে।
(গ) তবু বৎস,·· কহিতে অক্ষম।

মা

(দেবেন্দ্রনাথ সেন)

[মাতৃভূমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াও কবি যে শান্তি পান নাই, তাহারই আশায় আবার তিনি নিজের জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।]

তবু ভরিল না চিত্ত, ঘুরিয়া-ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম ; বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া ;
করিলাম পুণ্যস্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ;

"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি ভৈরবে বেড়িয়া
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে
রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া-গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে-কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বর-গুঞ্জমালা।
তবু ভরিল না চিত্ত ; সর্ব্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা, তোমার পাশে এসেছি আবার।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিখ।
২। ব্যাখ্যা কর—তবু ভরিল না···এসেছি আবার।

যমুনাতটে

(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

[বিরহকাতর কবির অন্তরে চন্দ্রমাবিধৌত প্রকৃতি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে ধরা দেয় কিন্তু তাঁহার অন্তর-বেদনা প্রশমিত হয় না ; হারানো জনের ব্যথায় প্রাণ উদ্বেল হইয়া উঠে ; বিরাট্ বৈরাগ্যে সারা অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠে।]

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল।
সমীরণ মৃদু-মৃদু ফুলমধু বয়,
কলকল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল।
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরুশাখা-'পরে,
নিরিবিলি ঝিঁঝিঁ ডাকে, জগৎ ঘুমায় ;—

হেন নিশি একা আসি', যমুনার তটে বসি',
হেরি শশী হুলে-হুলে জলে ভাসি' যায়।
কে আছে এ-ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজি এ-শ্মশান,
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ-অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ-জ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশান্ত নদীর তট, পর্ব্বত-উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে।
কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি' বনে গেলে—
সেই জানে প্রাণ, যার পুড়েছে হুতাশে।
ভাসায়ে' অকুল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হু হু ক'রে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,—
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি,
হেরিলে বিরলে বসি' গভীর নিশীথে,
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তায় গামী বিজন ভূমিতে!
হায়রে, প্রকৃতি-সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে—বুঝিতে না পারি,

নতুবা যামিনী-দিবা-প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী ?
কেন দিবসেতে ভুলি' থাকি সে-সকলে,
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায় ?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্ব'লে,
প্রাণের দোসর ভাই, প্রিয়ার ব্যথায় ?
কেন বা উৎসবে মাতি' থাকি কভু দিবারাতি,
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?
বসিয়া যমুনা-তটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে-ক্ষণে হ'লো মনে কত যে ভাবনা
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না !
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি' হৃদয় পূরিল ;
কত ভাঙ্গি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল !
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্ত-ভাঙ্গা মন যার, সেই সে বুঝিল !

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম্ম লিখ।
২। ব্যাখ্যা কর—(ক) জোনাকির পাঁতি ভাসি যায়।
(খ) কি সুখ যে…পুড়েছে হুতাশে।
(গ) কেন দিবসেতে…প্রিয়ার ব্যথায়।
(ঘ) বসিয়া যমুনা-তটে…যমের তাড়না।

শক্তি-ভিক্ষা

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[গর্ব্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি মনের সমস্ত মলিনতা দূর করিয়া অন্তর পবিত্র করিতে এবং সেই পবিত্র অন্তরে ভগবানের স্বরূপ ও সৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি করিবার শক্তি দান করিতে ভগবানের নিকট কবি প্রার্থনা জানাইতেছেন।]

বল দাও, মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি,
সকল হৃদয় লুটায়ে, তোমারে করিতে প্রণতি।
সরল সুপথে ভ্রমিতে,
সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে, খর্ব্ব করিতে কুমতি।
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে,
জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে, চিত্তের চির-বসতি।
তব কাজ শিরে বহিতে,
সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি।
তোমার বিশ্ব-ছবিতে
তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ-তারা-শশি-রবিতে হেরিতে তোমার আরতি।
বচন-মনের অতীতে
ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে-দুখে-লাভে-ক্ষতিতে, শুনিতে তোমার ভারতি।
বল দাও, মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি।

অনুশীলনী

কবিতাটির সারমর্ম্ম লিখ।
অথবা, কবিতাটিতে কবি কাহার নিকট কিসের প্রার্থনা জানাইতেছেন ?

মস্তক-বিক্রয়

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[বাহুবল অপেক্ষা মহত্ত্বের প্রভাব বেশী। কাশীরাজ বাহুবলে পরদুঃখকাতর কোশলরাজকে জয় করিলেন সত্য, কিন্তু কোশলরাজ যখন পরের উপকারের জন্য আত্মদান করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহার মহত্ত্বের নিকট কাশীরাজ মস্তক নত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।]

কোশল-নৃপতির তুলনা নাই, জগৎ জুড়ি' যশোগাথা ;
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই, দীনের তিনি পিতা-মাতা।
সে-কথা কাশীরাজ শুনিতে পেয়ে জ্বলিয়া মরে অভিমানে—
"আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে তাহারে বড় করি মানে।
আমার হ'তে যার আসন নীচে, তাহার দান হ'ল বেশি !
ধর্ম্ম, দয়া, মায়া, সকলি মিছে, এ শুধু তার রেষারেষি।"
কহিলা—"সেনাপতি, ধর কৃপাণ, সৈন্য কর সব জড়।
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান্, স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে বড়।"
চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধ-সাজে—কোশলরাজ হারি রণে,
রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে পলায়ে গেল দূর বনে।
কাশীর রাজা হাসি' কহে তখন, আপন সভাসদ্-মাঝে—
"ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন, তা'রই দাতা হওয়া সাজে।"
সকলে কাঁদি' বলে—"দারুণ রাহু এমন চাঁদেরেও হানে।
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু, চাহে না ধর্ম্মের পানে!"
"আমরা হইলাম পিতৃহারা"—কাঁদিয়া কহে দশদিক্ ;
"সকল জগতের বন্ধু যাঁরা, তাঁদের শত্রুরে ধিক্।"
শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি—"নগরে কেন এত শোক ?

আমি ত আছি, তবু কাহার লাগি' কাঁদিয়া মরে যত লোক ?
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু আমারে করিবে সে জয় ;
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু, শাস্ত্রে এইমত কয় ;
মন্ত্রি ! রটি' দাও নগর-মাঝে, ঘোষণা কর চারিধারে—
'যে ধরি' আনি দিবে কোশলরাজে, কনক শত দিব তারে' ।"
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটি, রটনা করে দিন-রাত ।
যে শোনে, আঁখি মুদি রসনা কাটি শিহরি কানে দেয় হাত ।
রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে, মলিন চীর দীন-বেশে ।
পথিক একজন অশ্রুনীরে একদা শুধাইল এসে—
"কোথায় বনবাসি, বনের শেষ ; কোশলে যাব কোন্ মুখে ?"
শুনিয়া রাজা কহে—"অভাগা দেশ, সেথায় যাবে কোন্ দুখে ?"
পথিক কহে—"আমি বণিক্ জাতি, ডুবিয়া গেছে মোর তরী,
এখন দ্বারে-দ্বারে হস্ত পাতি' কেমনে রব প্রাণ ধরি' ?
করুণা-পারাবার কোশল-পতি, শুনেছি নাম চারিধারে,
অনাথ-নাথ তিনি দীনের গতি, চ'লেছে দীন তাঁরি দ্বারে ।"
শুনিয়া নরনাথ ঈষৎ হেসে রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে কহিলা নিঃশ্বাস ছাড়ি—
"পান্থ, যেথা তব বাসনা পূরে, দেখায়ে দিব তারি পথ ;
এসেছ বহুদুখে অনেক দূরে সিদ্ধ হবে মনোরথ ।"
বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে, দাঁড়াল জটাধারী এসে ।
"হেথায় আগমন কিসের কাজে ?" নৃপতি শুধাইল হেসে ।
"কোশল-রাজ আমি, বন-ভবন", কহিলা বনবাসী ধীরে,
"আমারে ধরা পেলে যা দিবে পণ, দেহ তা মোর সাথীটিরে ।"
উঠিল চমকিয়া সভার লোক, নীরব হ'ল গৃহতল ।

বর্ম্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে অশ্রু করে ছলছল।
মৌন রহি' রাজা ক্ষণেক তরে হাসিয়া কহে—"ওহে বন্দি,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে এমনি করিয়াছ ফন্দী!
তোমার সে আশায় হানিব বাজ, জিনিব আজিকার রণে;
রাজ্য ফিরি দিব, হে মহারাজ, হৃদয় দিব তারি সনে।"
জীর্ণ চীর-পরা বনবাসীরে বসাল নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি দিল মলিন-শিরে, "ধন্য" কহে পুরজনে!

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের ভাষায় লিখ। কবিতাটি পড়িয়া তুমি কি শিক্ষালাভ করিলে?

২। ব্যাখ্যা কর—(ক) আমার বাহুবলে···সে জয়।
(খ) রাজ্যহীন রাজা···দীন-বেশে।
(গ) তোমার সে···তারি সনে।

মাতৃ-বন্দনা

(রজনীকান্ত সেন)

[সন্তান-বৎসলা জননীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় চিত্র। নিজের আহার-নিদ্রা, দুঃখ-কষ্ট সব ভুলিয়া সন্তানের মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলাই যেন জননীর জীবনের চরম সার্থকতা। জননী মাতৃরূপী মঙ্গলা, করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ। এহেন জননীর প্রতি অচলা ভক্তি রাখা প্রত্যেক সন্তানেরই কর্ত্তব্য।]

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে!
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ-লাগি রে।

শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে
অবশ কৃশতনু মলিন অনশনে ;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজসুখে,
তপ্ত তনু মম করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি', যাতনা-তাপ ভুলি'
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে

করুণা বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি' মম গভীর যন্ত্রণা ;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে' আঁখিজল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি-সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি' রে।

আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি'
শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহরাশি,
বক্ষে ধরি' চির পীযূষ-নির্ঝর ;
নিরাশ্রয় শিশু অসীম-নির্ভর।
নমো নমো নমো জননী দেবী মম !
অচলা মতি পদে মাগি রে।

অনুশীলনী

১। করুণাময়ী জননীর চিত্রটি তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। এরূপ জননীর প্রতি তোমার কর্তব্য কি ?

২। ব্যাখ্যা কর—(ক) স্নেহ-বিহ্বল...লাগি রে।
(খ) আপনি মঙ্গলা...পরম-নির্ভর।

আমার দেশ

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

[ধনে, জনে, বীরত্বে, শিক্ষায় ও ধর্ম্মে বাঙ্গালার অতীত ইতিহাস গৌরব-মণ্ডিত ছিল। জগতের পূজনীয় বুদ্ধদেব, প্রেমধর্ম্মের মূর্ত্তপ্রতীক শ্রীচৈতন্যের মত মহাপুরুষ, প্রতাপাদিত্যের মত বীর যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস আজ সাময়িকভাবে দুঃখের আঁধারে মলিন হইয়া থাকিলেও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। অদূর ভবিষ্যতেই এই দুর্দ্দশার অবসান হইবে, বাঙ্গালী আবার বিশ্বের বিস্ময় হইয়া উঠিবে।]

বঙ্গ আমার। জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ!
কেন গো মা, তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা, তোর রুক্ষ কেশ?
কেন গো মা, তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা, তোর মলিন বেশ?
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে—"আমার দেশ!"

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর;
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি-শেষ,
তুই কি-না মাগো, তাঁদের জননী, তুই কি-না মাগো তাঁদের দেশ!

একদা যাঁহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাঁহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়;
সন্তান যাঁর তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তাঁ'র কি-না এই ধূলায় আসন, তাঁ'র কি-না এই ছিন্ন বেশ!

উঠিল যেখানে মুরজ-মন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান ;
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই ত মা, সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা যদি এ-শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ।

যদিও মা, তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর ;
আমরা ঘুচাব মা, তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি ত মেষ !
দেবি আমার ! সাধনা আমার ! স্বর্গ আমার ! আমার দেশ !

কোরাস্

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ।
সপ্ত:কোটি মিলিত-কণ্ঠে ডাকে যখন—"আমার দেশ ॥"

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিখ। ২। কবিতাটিতে বাঙ্গালীজাতির যে গৌরবময় ইতিহাসের উল্লেখ আছে, তাহা বুঝাইয়া বল।

২। ব্যাখ্যা কর—(ক) উদিল যেখানে··তাঁদের দেশ।
(খ) একদা যাঁহার·· এই ছিন্নবেশ।
(গ) উঠিল যেখানে···তাঁদের রক্তলেশ।
(ঘ) যদিও মা···ললাটে তোর।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
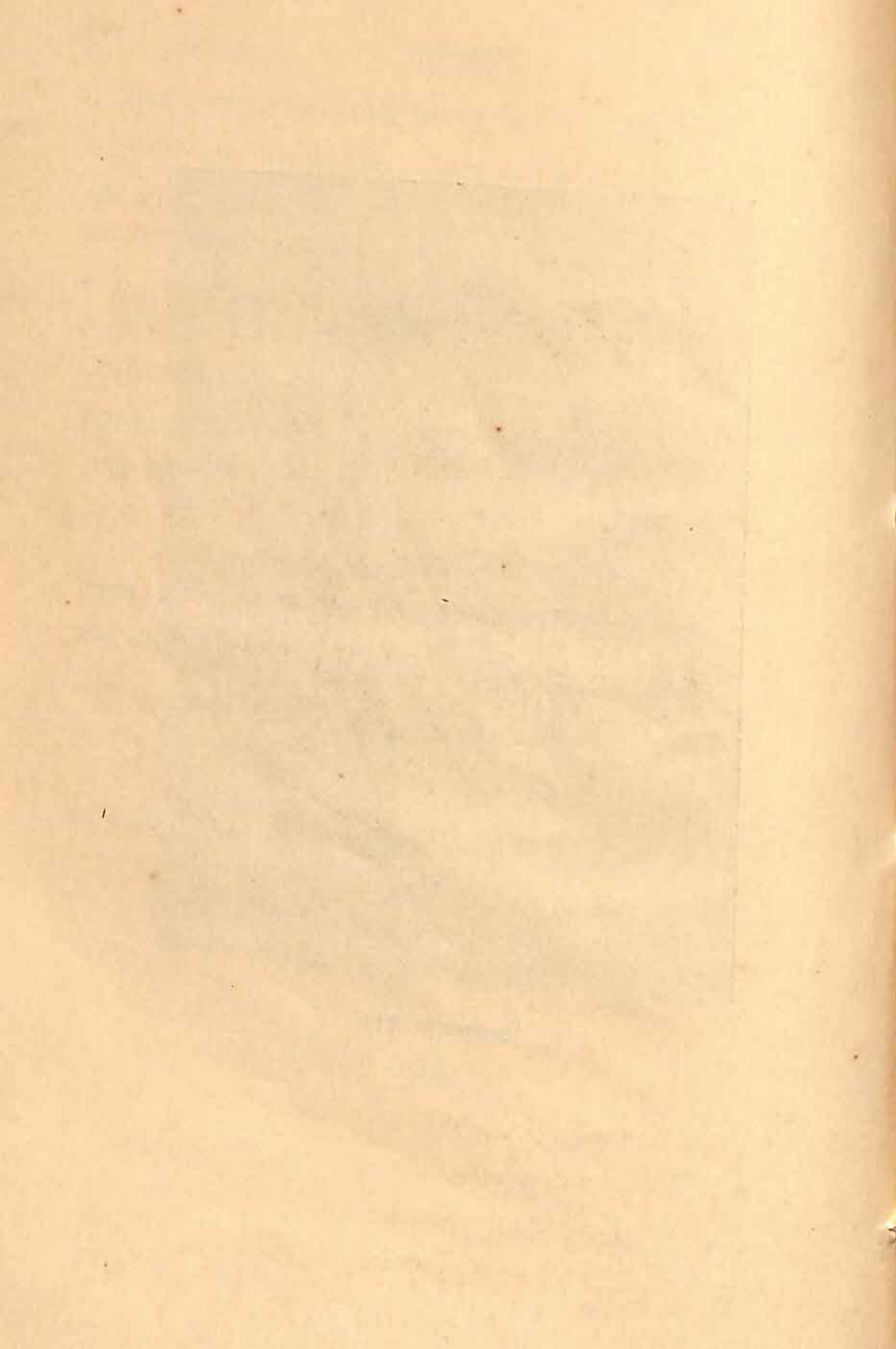
বাংলাদেশ

(**সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত**)

[শ্যামল বাঙ্গালাদেশ সোনার বরণ ধান ও নানাবিধ ফলফুলে পরিপূর্ণ। পাখীর তানে এদেশের প্রকৃতি মুখরিত। এদেশের কবির প্রাণ-মাতানো কণ্ঠ জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। এদেশের গৌরবে আমরা নিজেদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি।]

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চ'লতে গেলেই
দ'লতে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?

কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল-শ্যামা,
ফিঙে নাচে গাছে-গাছে ?
কোথায় জলে মরাল চলে
মরালী তার পাছে-পাছে ?

বাবুই কোথায় বাসা বোনে
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি'
আকুল করি' তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পা'ব
বাউল সুরের মধুর গান ?

চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের,
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা
সবার অধিক পাই রে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?

মোদের পিতৃপিতামহের
চরণধূলি কোথায় রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ
আমাদেরি বাংলা রে !

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর—(ক) কোথায় ডাকে··· যাচে রে ?
(খ) কোন্ ভাষা··· মধুর গান ?

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
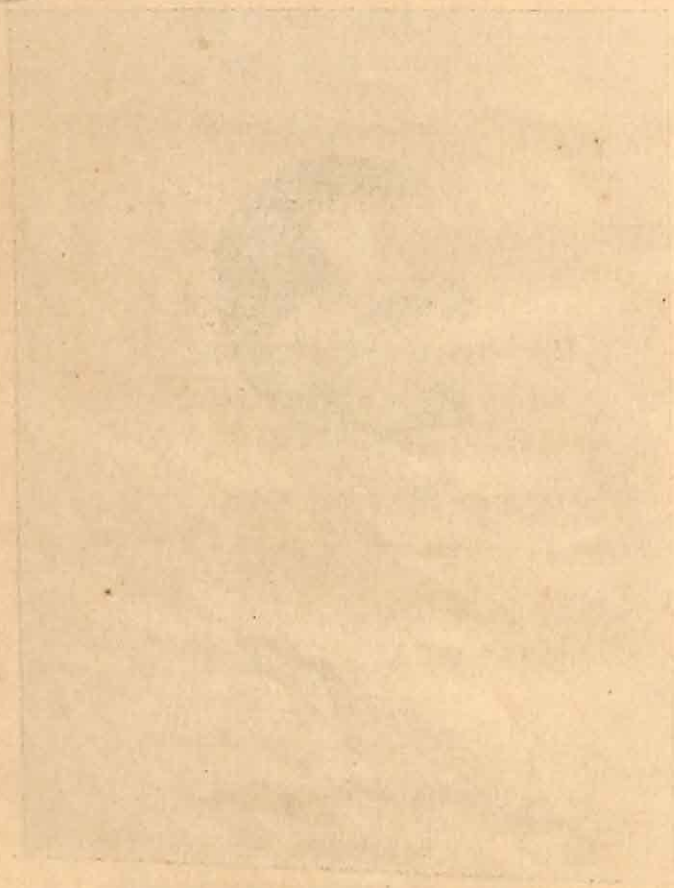
মেথর

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

[মেথর ঘৃণার পাত্র নহে। আমরা বুঝিতে না পারিয়া অশুচি বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করি বটে, কিন্তু সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করিয়া সে যে আমাদিগকে শুচি করিয়া তুলিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলে তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া আমরা থাকিতে পারিব না। জননী যেমন সন্তানের ক্লেদ মুছাইয়া তাহাকে পরিষ্কার রাখেন, মেথরও সেইরূপ সন্তান-জ্ঞানে আমাদের সেবা করে। কবি তাই বন্ধুরূপে তাহাকে বুকে টানিয়া লইতে চাহেন।]

কে বলে তোমারে বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমার পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।
শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রি-দিন সর্ব্ব ক্লেদ-গ্লানি।
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।
নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্ব্বিকারে সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল।
নীলকণ্ঠ ক'রেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ ;
আর তুমি ! তুমি তারে ক'রেছ নির্ম্মল।
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিখ।
২। ব্যাখ্যা কর— ক) কে বলে তোমারে ··যেত বনে।
(খ) শিশুজ্ঞানে···ক্লেদ-গ্লানি।
(গ) নীলকণ্ঠ···করেছ নির্ম্মল।

বর্ষ-সঙ্গীত

(কামিনী রায়)

[অবিরাম গতিতে সময় ছুটিয়া চলে ; মানবের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, আশা-নিরাশার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে। আর একটি নূতন বৎসর শত আশা, সহস্র আকাঙ্ক্ষার ডালি হাতে লইয়া আসে ; অতীতের বেদনা মানুষ ভুলিয়া যায়, নবীন উদ্যমে জাগিয়া উঠে, কর্ম্মের মধ্যে আবার ব্যর্থতা আসে। সময়ের গতির সঙ্গে-সঙ্গে মানবজীবন এইরূপ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়।]

আপনার বেগে আপনার মনে
কোথায় বরষ চলিয়া যায়,
অপূর্ণ বাসনা রহিল কাহার,
দেখিতে বারেক ফিরি' না চায়।
কার নয়নের ফুরাল না জল,
শুকাল না কার প্রাণের ক্ষত,
কাহার হৃদয় নিশীথে-দিবায়
জ্বলিছে ভীষণ চিতার মত,
কাহার কণ্ঠের মুকুতার মালা
ছিঁড়িয়া পড়িল শতধা হ'য়ে,
কার হৃদিশোভা বিকচ কুসুম
শুকাইয়া গেল হৃদয় ছুঁয়ে,
দেখিবারে তাহা মুহূর্ত্তের তরে
থামিল না ওর অস্তের পথে,
ওই যায় চলে, ওই যায়—যায়
সৌর-দ্যুতিময় দ্রুতগ রথে।

বরষের পর বরষ যাইছে
বিদায়ের কালে চরণে তার
কত প্রাণ ভাঙ্গি', কত আঁখি দিয়া
পড়িছে তরল মুকুতা-ভার ;
আপনার ভাবে, আপনার মনে,
অশ্রুসিক্ত-পদে চলিয়া যায়,
শোনে না কাহারো রোদনের রব,
কারো মুখপানে ফিরি' না চায়।
ম্রিয়মাণ প্রাণ আশা ভর করি
বরষ-প্রভাতে দাঁড়ায় উঠে,
নবীন উষায় হৃদয়-কাননে
আবার নবীন কুসুম ফুটে।
জীবন-বেলায় আবার খেলায়
কল্পনার মৃদু লহরীমালা,
ভুলে যাই গত বিষাদ-বেদন,
শত নিরাশার দারুণ জ্বালা।
একটি প্রভাত সুখে কেটে যায়
আশার মৃদুল সুরভি বায়,
একদিন রাখে শ্রান্তি ভুলাইয়া
একদিন পাখী মধুরে গায়।
আবার, আবার, ফিরিয়া ঘুরিয়া
তেমনি শতেক নিরাশা আসে,
তেমনি করিয়া ঘন অন্ধকার
হৃদয়-গগন আবার গ্রাসে।

পড়িয়া, উঠিয়া, থামিয়া, চলিয়া,
পায়ে জড়াইয়া কণ্টকরাশি,
জীবনের পথে চলি অবিরাম,
কখন বা কাঁদি, কখন হাসি।
আপনার বেগে, আপনার মনে
আবার বরষ চলিয়া যায়,
কে পড়িল পথে কে উঠি চলিল,
দেখিবার তরে ফিরে না চায়।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম লিখ। ২। চিরগতিশীল বৎসর কিভাবে মানুষের সুখ-দুঃখ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, তাহা নিজের ভাষায় বল।

৩। ব্যাখ্যা কর—(ক) ম্রিয়মাণ প্রাণ···কুসুম ফুটে।
(খ) আবার, আবার···আবার গ্রাসে।

সবারে বাস্‌রে ভাল

(অতুলপ্রসাদ সেন)

[প্রাণ খুলে সবাইকে ভালবাসিতে শিখিলে আমাদের মনের কালিমা দূর হয়, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়। আপন-পর ভাবিবার কোন সার্থকতা নাই ; কারণ সকলেই সেই এক পরমেশ্বরের সন্তান।]

সবারে বাস্‌রে ভাল ;
নইলে মনের কাল ঘুচ্‌বে না রে !
আছে তোর যাহা ভাল,
ফুলের মত দে সবারে।

করি তুই আপন-আপন,
হারালি যা ছিল আপন ;
এবার তোর ভরা আপণ
বিলিয়ে দে তুই যারে-তারে ॥

যারে তুই ভাবিস্‌ ফণী,
তারো মাথায় আছে মণি,
বাজা তোর প্রেমের বাঁশী,
ভবের বনে ভয় বা কারে !

সবাই যে তোর মায়ের ছেলে,
রাখ্‌বি কারে, কারে ফেলে !
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ওপারে ।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিখ ।
২। ব্যাখ্যা কর—(ক) করি তুই···যারে-তারে ।
(খ) যারে তুই·· ভয় বা কারে ।
(গ) সবাই যে···রে ওপারে ।

বঙ্গভাষা

(অতুলপ্রসাদ সেন)

[বাঙ্গালাভাষার মধ্যেই বাঙ্গালীজাতির গৌরব নিহিত। অতি সাধারণ কথোপকথন হইতে আরম্ভ করিয়া অতি উচ্চস্তরের কাব্য এবং দর্শনও এই ভাষার মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এদেশের চাষীর গানে যেমন একটা অপার্থিব আনন্দ ফুটিয়া উঠে, তেমনি এদেশের কবিদের ভাষায়ও চিরন্তন মহামিলনের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে।]

মোদের গরব, মোদে আশা—আ-মরি বাঙ্‌লা-ভাষা !
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালবাসা।
কি যাদু বাঙ্‌লা-গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ॥
ওই ভাষাতেই নিতাই-গোরা, আন্‌লে দেশে ভক্তিধারা ;
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-ক্লান্তি-নাশা ॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম ও নবীন
ঐ ভাষাতেই মধুর-রসে বাঁধ্‌ল সুখে মধুর বাসা ॥
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে আন্‌লে মালা জগৎ জিনে ;
তোমার চরণ-তীর্থে মাগো, জগৎ করে যাওয়া-আসা ॥
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে ডাক্‌নু মায়ে 'মা মা' ব'লে ;
ঐ ভাষাতেই ব'ল্‌ব হরি, সাঙ্গ হ'লে কাঁদা-হাসা ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম লিখ।
২। ব্যাখ্যা কর—(ক) বাজিয়ে রবি···যাওয়া-আসা।
(খ) ঐ ভাষাতেই···কাঁদা-হাসা।

দেশভক্তি

(যোগীন্দ্রনাথ বসু)

[আমরা যে দেশভক্তির বড়াই করিয়া বেড়াই, তাহা প্রকৃত দেশভক্তি নয়, প্রতারকের ছদ্মবেশ মাত্র। দেশভক্তির পরিচয় বাক্যে নয়, কর্ম্মে। আমাদের অন্তরে সত্যিকারের দেশভক্তি থাকিলে দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-শোকে পরিপূর্ণ দেশকে উপেক্ষা করিয়া বিলাসে ডুবিয়া থাকিতে পারিতাম না। কবি তাই অন্তরে সত্যিকারের দেশভক্তি লাভ করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন।]

সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভালো ? স্বদেশজননি !
কহি বটে, সাধনার ধন তুমি, নয়নের মণি।
কিন্তু যবে অন্তরেতে-অন্তরেতে করি নিরীক্ষণ,
বুঝি সব শূন্যগর্ভ, অর্থহীন অলীক বচন।
প্রবঞ্চিত প্রবঞ্চক হ'য়ে হেন র'ব কতকাল ?
পূত, শুদ্ধ কর মা গো, দূর কর মনের জঞ্জাল।
পারিতাম সত্য যদি মাতৃরূপে ভাবিতে তোমারে,
হইতাম বধির কি এত ডাকে, এত হাহাকারে ?
দারিদ্র্যের কশাঘাতে কাঁদে ভ্রাতা, কাঁদে ভগ্নী মোর,
বিলাসে নিমগ্ন আমি, কই ঝরে নয়নের লোর ?
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে কোটি-কোটি জন,
একটিও দীপ আমি নাহি করি কেন প্রজ্বালন ?
কোটি কণ্ঠে রোগে-শোকে শুনি উঠে তীব্র আর্ত্তনাদ,
আমি হাসি হা-হা ক'রে, নাহি চিন্তা, নাহিক বিষাদ !
সত্য দেশভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয়,
দেশভক্তি ত্যাগে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, প্রেমে,—বচনেতে নয়।

বাক্যভারে ভারাক্রান্ত, অবসন্ন হ'য়ে গেছে প্রাণ,
কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তি, স্ফূর্ত্তি, অন্তর্য্যামি! কর মোরে দান।
অকপটে তব পদে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ!
সত্য-সত্য বুঝি যেন মাতৃরূপা আমার স্বদেশ!

অনুশীলনী

১। দেশভক্তি কবিতাটির ভাবার্থ লিখ।

২। সত্যিকারের দেশভক্তি কিরূপ? এই কবিতায় আমাদের অর্থহীন দেশভক্তির যে রূপ কবি আঁকিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া বল।

৩। ব্যাখ্যা কর—(ক) সত্য দেশভক্তি…বচনেতে!
(খ) বাক্যভারে…কর মোরে দান।

বৃন্দাবন অন্ধকার

(কালিদাস রায়)

[আলোচ্য কবিতাটিতে শ্রীকৃষ্ণ-হীন বৃন্দাবনের বিরহ-কাতর চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে।]

নন্দ-পুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
বহে না চল মন্দানিল লুটিয়া ফুল-গন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ, ফুটে না বনে কুন্দ-নীপ
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া পিক-চন্দনার।
নন্দ-পুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার॥

ছোঁয় না তৃণ গোধনগুলি, ছুটিছে মাঠে পুচ্ছ তুলি,
করে না শ্যাম-রাধিকা ল'য়ে শারিকা-শুক দ্বন্দ্ব আর।
সজল-ঢল-আয়ত-আঁখি, পিয়াল-ফুল-পরাগ মাখি',
ঘুরিছে খুঁজি' লেহন ক'রে মৃগ পদারবিন্দ কার?
নন্দ-পুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার॥

সলিল-কেলি-ফেনিল-জলে, যমুনা আর নাহিক চলে,
পাটনী কাঁদি' তরণী বাঁধি' ক'রেছে খেয়া বন্ধ তার।
নূপুর-হার হারানো ছলে, বধূরা মিছে যমুনা-জলে,
করে না ব্যাজ শুনিয়া আজ বাঁশিটি শ্যাম-চন্দ্রমার।
নন্দ-পুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার॥

বাতাসে শ্বসে বেতসীবন, গুমরি' মরে হতাশ মন,
কুঞ্জে নাহি ঝুলন-দোল, মধু মিলনানন্দ আর।
গোঠের ধূলি অঙ্গে মাখি', রাখাল ফেরে উদাস-আঁখি,
ঘুরিছে মিছে, কুসুম তুলে নাহি সে দেব বন্দনার।
নন্দ-পুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার॥

যশোদা আজি মলিনা, দীনা, লুটায়ে' ভূমে চেতনা-হীনা,
রোদনে আঁখি অন্ধ হ'ল, তুলে না মুখ নন্দ আর।
কীচক-বনে বাজে না বাঁশী নাহিক গান, নাহিক হাসি,
নর-নারীর কণ্ঠে আজি দুলে না প্রেমানন্দ হার।
নন্দ-পুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম্ম লিখ। অথবা শ্রীকৃষ্ণ-হীন বৃন্দাবনের রূপ বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর—যশোদা আজি…প্রেমানন্দ হার।

বাঁশ ও বাঁশী

(যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

[মানুষ নিজের প্রয়োজনমত প্রকৃতির নিকট হইতে অনেক সুবিধা আদায় করিয়া লইতেছে। বাঁশ প্রকৃতির নিজস্ব জিনিষ, কিন্তু মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য বাঁশীর রূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পিতার অনুপস্থিতিতে গেনুদাসের অন্তরে যে বেদনা জাগিয়াছিল, বাঁশবাগানের এক টুক্‌রা বাঁশ বাঁশী হইয়া তাহাই প্রকাশ করিতে লাগিল।]

বাদ্‌লা-সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়া নুইয়ে চলে বাঁশের বন,
কোল-আঁধারে দাওয়ায় ব'সে উদাস গেনুদাসের মন।
গাঁয়ের শেষে ডোমপাড়া, আর তার পরেতে শুধুই বাঁশ,
বাঁশ-বাগানের একটি পাশে বাস করে ডোম খুদুই দাস।
খুদুই দাসের কত-সাধের মা-মরা এই ছেলে গেনু,
দিনমানে ধেনু চরায়, রাত্তিরে সে বাজায় বেণু।
বাপ গিয়েছে চুপ্‌ড়ি নিয়ে হাটবারে আজ ভিন্ন গাঁয়ে ;
বাদ্‌লা বেলা কাটিয়ে গেনু বেণুবনের ছিন্ন ছায়ে,
আষাঢ়-সাঁঝের আব্‌ছা আলোয় ধেনু ল'য়ে ফির্‌ল বাড়ী,
বাপ এখনো ফেরেনিকো সেই দুখে কি মনটা ভারী ?
হঠাৎ যেন ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল সারা বাঁশ-বাগানি,
পরক্ষণেই ফুট্‌ল যেন জমাট ব্যথার কাতর বাণী।
বাদ্‌লা-সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়ায় কৌতূহলে অন্যমনে
দা-হাতে সেই ডোমের ছেলে ঢুক্‌ল গিয়ে বাঁশের বনে।
কঞ্চি-ছিঁড়ে আছ্‌ড়ে পড়ে ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কা খেয়ে,
টিপ্‌টিপিয়ে বাদল ঝরে ভিজে পাতার প্রান্ত বেয়ে।
আঁধার ক্রমে আস্‌ছে জ'মে, ডোমের ছেলে ঈষৎ হেসে
কোপ লাগালে তল্‌তা-ঝাড়ে লম্বা পাবের কণ্ঠ ঘেঁসে।

বাদ্‌লা-সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়া নুইয়ে চলে বাঁশের বন,
কোল-আঁধারে দাওয়ায় ব'সে উদাস গেনুদাসের মন!
ঝোড়ো হাওয়ায় অন্ধকারে বাঁশঝাড়ে বাঁশ আছ্‌ড়ে পড়ে,
তল্‌তা-বাঁশের পাবটি নিয়ে ফির্‌ল গেনু আপন-ঘরে।
বাপ বুঝি আজ ফির্‌বে না আর! জ্বালিয়ে আগুন বস্‌ল গেনু,
ফুটো ক'রে নূতন পাবে বানিয়ে নেবে নূতন বেণু।
তাতিয়ে নিয়ে ভাঙা বেড়ি, তপ্ত তাতাল বাগিয়ে ধ'রে,
ছ্যাঁক্‌-ছেঁকিয়ে বাঁশের বুকে নিল ক'টা ছিদ্র ক'রে।
বাঁশের বুকে ক্ষতের মুখে ফুঁয়ে বাজে সাতটা সুর,
নূতন বাঁশের নূতন বাঁশী বাজিয়ে কাটে রাত দুপুর।
গাইছে বেণু গেনুর ফুঁয়ে পরের বুকের সুখের গান,
বাঁশ-বাগানে সমানে চলে আষাঢ়-রাতের ঝড়-তুফান।
হাস্‌ছে বাঁশী, বাজ্‌ছে বাঁশী, চড়্‌চড়িয়ে ফাট্‌ছে বাঁশ,
হেথায় উঠে উৎস সুরের, হোথায় কাঁদে হা-হুতাশ!
বাদল-সাঁঝের বেদন-ভরা বাঁশ-বাগানের তল্‌তা-বাঁশই
গোটা-কতক ছ্যাঁকায় ভুলে হ'ল ডোমের সুখের বাঁশী!

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিখ।

২। গেনুদাস কে? তাহার মন উদাস হওয়ার কারণ কি? উদাসীনভাবে সে কি করিল?

৩। ব্যাখ্যা কর—বাদল-সাঁঝের···সুখের বাঁশী।

লোহার ব্যথা

(যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

[কর্ম্মকার লোহাকে পুড়াইয়া পিটাইয়া মনের মতন করিয়া গড়িয়া নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। হয়ত তাহাতে সারা মানবজাতির উপকার হয়; কিন্তু লোহার তাহাতে কোন উপকার হয় না। লোহা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে চায়, কিন্তু সুযোগ পায় না। সারা মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায়—একশ্রেণীর সবল মানব অন্যশ্রেণীর দুর্ব্বল মানবের সাহায্যে নিজের সুবিধা আদায় করিয়া লইতেছে। দুর্ব্বলের ইহাতে দুঃখের অন্ত নাই। প্রতিবাদ করিবার ভাষা তাহার নাই, শক্তিও নাই।]

ও ভাই কর্ম্মকার,
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম্ম আর ?
কোন্ ভোরে সেই ধ'রেছ হাতুড়ি, রাত্রি গভীর হ'ল,
ঝিল্লীমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোল গো যন্ত্র তোল।
ঠকা-ঠাই-ঠাই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত সাঁড়াশী ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে।
দেখ গো হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি ;
ক্লান্ত নিখিল, কর গো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি।
রাত্রি দুপুরে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে,
ভাঙিলে গড়িলে সিধা, বাঁকা, গোল, লম্বা, চৌকা ক'রে,
কভু আতপ্ত, কভু লাল, কভু উজ্জ্বল রবি-সম,
কভু বা সলিলে করিলে শীতল অসহ্য দাহ মম।

অজানা দু'জনে গলায়ে আগুনে জুড়িয়া মিটালে সাধ,
ধড় হ'তে কভু বাহুল্যবোধে মাথা কেটে দিলে বাদ ;
ঘন-ঘন-ঘন পরিবর্ত্তনে আপনা চিনিতে নারি,
স্থির হ'য়ে যাই, ভাবিবারে চাই, পড়ে হাতুড়ির বাড়ি।
আগুনের তাপে সাঁড়াশীর চাপে আমি চির নিরুপায়,
তবু সগর্ব্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায় হোক না প্রবল করিয়াছি প্রতিবাদ ;
আমার বুকের কোমল অংশ কে বলিল তারে খাদ ?

ও ভাই কর্ম্মকার!

রাত্রি সাক্ষী তোমার উপরে দিলাম ধর্ম্মভার
কহ গো বন্ধু কহ, কানে-কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,'
আমি না থাকিলে মারা যে'ত না কি তোমার দিনের রুজি ;
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু, কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি ?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়ির মারফতি ?
কি কহিছ ভাই, আমি হ'ব তুমি এই প্রেম সহি যদি ?
পিটনের গুণে লোহা কবে হায়, পায় কামারের গদি।

অনুশীলনী

১। কবিতার ভাষাটি সহজ কথায় বুঝাইয়া বল।
২। ব্যাখ্যা কর—কহ গো বন্ধু,…হাতুড়ির মারফতি ?

পল্লীরাণী

(সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়)

[পল্লীই ছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মেরুদণ্ড। এই ভারতীয় পল্লীতে জাত বিচিত্র শিল্পসম্ভার ও ধন-ধান্য সভ্য-জগতের ভাণ্ডার একদিন পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার ফলে নগর সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে; আর পল্লীর গৌরবময় ইতিহাস আজ লুপ্ত; কিন্তু এই পল্লীসভ্যতা অদূর-ভবিষ্যতেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে; আর এই সভ্যতার মধ্য দিয়া তাহার লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার হইবে।]

আমার পল্লীরাণি!

লুপ্ত তোমার দীপ্ত গরিমা, কণ্ঠে নাহিক বাণী।
গৌরবময়ি গৌরবহীনা, দাঁড়াইয়া অয়ি ভিখারিণি দীনা,
উজ্জ্বল-শ্যাম সুন্দর দেহে আজি কজ্জল-ছায়া।
নয়নে উথলে অশ্রু-সিন্ধু, জলদ-মলিন বদন-ইন্দু
চরণ-নলিন আর না বিতরে মধুভরা দয়ামায়া!

আমার পল্লীরাণি!

বিশ্বের তরে নিঃস্ব ক'রেছ ঋদ্ধ হৃদয়খানি।
অতিথি ডাকিয়া উটজাঙ্গনে, অঞ্চল ভ'রে দেছ ধানে-ধনে,
শতেক পল্লী-সন্তান-সনে কত না মোহন-মেলা!
লোকালয় হ'য়ে আছে ঘন বন, পথ-ঘাট-মাঠ আঁধার-মগন,
ভগ্নসৌধে পেচক নিবসে, শিবাকুল করে খেলা।

জননি পল্লীরাণি!

তোমার পুণ্য চরণ-পরশে কেটে যাবে সব গ্লানি।
এস দেবি, তুমি শক্তিস্বরূপা, গুণ-গরিমায় অতুল অনুপা,
নূতন করিয়া গড় তুমি দেবি, মোদের পল্লীভূমি।

চেতনা-শক্তি বরাভয়-দানে, সুখ-সম্পদে-ধনে-জনে-মানে
শূন্য পল্লীভবন মোদের পূর্ণ কর মা, তুমি।

অনুশীলনী

১। বর্ত্তমান পল্লীর দুরবস্থার যে চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। পল্লীর ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কবি কিরূপ আশা পোষণ করেন ?

২। ব্যাখ্যা কর—(ক) নয়নে উথলে···দয়ামায়া।
(খ) বিশ্বের তরে···করে খেলা।
(গ) চেতনা-শক্তি···কর মা, তুমি।

ছাত্রদলের গান

(কাজী নজরুল ইস্‌লাম)

[ছাত্রদল বলবীর্য্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। অদম্য উৎসাহে তাহারা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া লক্ষ্যহীন ধূমকেতুর মত ছুটিয়া চলে। আত্মদান করিয়া তাহারা জগতের সভ্যতায় আমূল পরিবর্ত্তন আনে, বুকের রক্ত দিয়া তাহারা জাতির ইতিহাস গড়িয়া তোলে। ভুল তাহারা করে, কিন্তু এই ভুলের মধ্য দিয়াই তাহারা সত্যের সন্ধান পায়। জ্ঞানের পূজারী, মুক্তি-সংগ্রামের কাণ্ডারী ছাত্রদল দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবে।]

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল!
মোদের পায়ের তলায় মূর্চ্ছে তুফান
ঊর্দ্ধে বিমান ঝড়-বাদল!
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার ঘায়!
যুগে-যুগে রক্ত মোদের
সিক্ত হ'ল পৃথ্বীতল।
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-প্রায়।
লক্ষ্যহারা প্রাণ
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর
নিত্য বলিদান।
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে উঠেন
আমরা পশি নীল অতল।
আমরা ছাত্রদল॥

আমরা ধরি মৃত্যুরাজার
যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ,
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের
জীবন-ইতিহাস!
হাসির দেশে আমরা আনি
সর্ব্বনাশী চোখের জল।
আমরা ছাত্রদল॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

সবাই যখন বুদ্ধি জোগায়
আমরা করি ভুল।
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব
আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ-রাতে আমরা তরুণ
রক্তে করি পথ পিছল।
আমরা ছাত্রদল॥
মোদের চ'ক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক্,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্য কালের ডাক।
আমরা তাজা খুনে লাল ক'রেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল।
আমরা ছাত্রদল॥
ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে
আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে
বিংশ শতাব্দীর!
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে
ভ'রেছি মা'র শ্যাম আঁচল।
আমরা ছাত্রদল॥
আমরা রচি ভালোবাসার
আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায়

আকাশ-ছায়াপথ !
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিখ। ২। কবিতাটিতে ছাত্রদের বক্তব্য কি ?

সঙ্কল্প

(কাজী নজরুল ইসলাম)

[বৈচিত্র্যহীন সংসার-বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকার ইচ্ছা কবির আর নাই। সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্য উপভোগ করার এক অদম্য বাসনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে।]

থাক্‌ব না'ক বদ্ধ ঘরে দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে
কেমন ক'রে ঘুর্‌ছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হ'তে দেশান্তরে
ছুট্‌ছে ঝড়ী কেমন ক'রে।
কিসের নেশায় কেমন ক'রে ম'র্‌তেছে বীর লাখে-লাখে,
কিসের আশায় ক'র্‌ছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।
কেমন ক'রে বীর ডুবুরী সিন্ধু ছেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন ক'রে দুঃসাহসী চ'ল্‌ছে উড়ে স্বর্গপানে।
জাপ্‌টে ধ'রে ঢেউয়ের ঝুঁটি
যুদ্ধ-জাহাজ চ'ল্‌ছে ছুটি
কেমন ক'রে আন্‌ছে মাণিক বোঝাই ক'রে সিন্ধু-যানে,
কেমন জোরে টান্‌লে সাগর উথ্‌লে ওঠে জোয়ার-বানে।

কেমন ক'রে ম'থ্‌লে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চ'ল্‌ছে হিমালয়ের চূড়ে।
তুহিন-মেরু পার হ'য়ে যায়
সন্ধানীরা কিসের আশায় ;
হাউই চ'ড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন্‌ পুরে,
শুন্‌ব আমি ইঙ্গিত কোন্‌ মঙ্গল হ'তে আস্‌ছে উড়ে।

রইব না'ক বদ্ধ খাঁচায়, দেখ্‌ব এ-সব ভুবন ঘুরে
আকাশ-বাতাস, চন্দ্রতারায়, সাগর-জলে, পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে
দশদিকেতে প'ড়ব লুটে,
পাতাল ফেঁড়ে নাম্‌ব নীচে, উঠ্‌ব আমি আকাশ ফুঁড়ে,
বিশ্বজগৎ দেখ্‌ব আমি আপন হাতের মুঠোয় পূরে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিখ।

অথবা

কবির বক্তব্য বিষয়টি সহজ কথায় বুঝাইয়া দাও।

২। ব্যাখ্যা কর—(ক) জাপ্‌টে ধ'রে···জোয়ার-বানে।
(খ) কেমন ক'রে ম'থ্‌লে···আস্‌ছে উড়ে।
(গ) আমার সীমার···মুঠোয় পূরে।

ছাত্র-সঙ্গীত

(কালিদাস রায়)

[ছাত্রেরাই দেশের ভবিষ্যৎ ; সুতরাং আদর্শ নাগরিক হইয়া উঠিবার জন্য সত্যকে তাহাদের আদর্শ করিয়া লইতে হইবে, সাধনার বলে জাতীয় উন্নতি-সাধনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে এবং বাধাবিঘ্নকে ভয় না করিয়া বীরের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।]

মোরা—গাহি সত্যের জয়,
সদা—বরিব সত্যে, স্মরিব সত্যে, দূরিব মিথ্যা ভয়॥
সহি'—সকল দুঃখতাপ
মোরা—ঘুচাব ভ্রান্তিপাপ,
মোরা—বরিয়া বেদনা তপের সাধনা মুছাব জাতীয় শাপ।
মোরা—শির পাতি লব সকল দণ্ড অপরাধ যদি হয়॥

মোরা—রাখিতে ন্যায়ের মান
হেসে—সকলি করিব দান,
মোরা—ভোগবিলাসের শফরী-লীলায় হ'ব না মুহ্যমান।
হীন—স্বার্থের সাথে মনুষ্যত্ব করিব না বিনিময়॥

হ'ব—জীবন-সমরে শূর,
হীন—জড়তা করিব দূর,
মোরা—হেরি' মিথ্যার আপাত-বিজয় হ'ব না শঙ্কাতুর।
মোরা—রুদ্রের শূলে ভয় করিব না, কেড়ে লব বরাভয়॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম্ম লিখ। ২। ছাত্রের কর্ত্তব্য কি কি হওয়া উচিত?
৩। ব্যাখ্যা কর :—(ক) মোরা—বরিয়া যদি হয়।
(খ) মোরা—রাখিতে···বিনিময়।
(গ) মোরা—হেরি'···লব বরাভয়।

আগামী

(সুকান্ত ভট্টাচার্য্য)

[এই কবিতায় একটি অঙ্কুরিত বীজের মনের কথা, তাহার ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা বলা হইয়াছে। সে একদিন চারাগাছ হইবে, তারপর মস্ত বৃক্ষ, হয়ত এক বনস্পতিতে পরিণত হইবে। তুমিও তো এইরূপ আজ এক কিশোর বালক আছ, একদিন তুমি তরুণ যুবক হইবে, শেষে হয়ত এক শক্তিমান্ পুরুষে রূপান্তরিত হইবে ; হয়ত তুমি এখন বালিকা, পরে এক মহীয়সী নারীতে তোমার পরিণতি ঘটিবে। তোমার স্বপ্নের কথাও এই কবিতায় নিহিত আছে।]

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ ;
মাটিতে লালিত ভীরু ; শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে র'য়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে,
তবু ক্ষুদ্র এ-শরীরে গোপনে মর্ম্মর-ধ্বনি বাজে।
বিদীর্ণ ক'রেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা,
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম বায়ুর তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা।
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেবো সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড়
শাখায়-শাখায় বাঁধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়।

অঙ্কুরিত বন্ধু যতো মাথা তুলে আমারি আহ্বানে,
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে,
জয়ধ্বনি কিশলয়ে, সংবর্দ্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ নই, জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সে-দিন ছায়ায় এসো, হান যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেবো বারে-বারে।
ফল দেবো ফুল দেবো দেবো আমি পাখীর কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ নিজের ভাষায় রচনা কর।
২। তোমার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন কি? সে-সম্বন্ধে একটি রচনা লিখ।
৩। ব্যাখ্যা কর—(ক) যদিও নগণ্য…গাছেদের মুখে।
(খ) আগামী বসন্তে…তারি তো সম্মতি।
(গ) ফল দেবো ফুল…আপনার জন।